ওরা ১১ জন

কথিত বুদ্ধিজীবীদের স্বরূপ সন্ধানে

কে এম সোবহান

আব্দুল গাফফার চৌধুরী

শামসুর রাহমান

শাহরিয়ার কবীর

নীলিমা ইব্রাহিম

ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম

কবীর চৌধুরী

মুস্তফা নূর-উল ইসলাম

মুনতাসীর মামুন

আবেদ খান

এম আর আখতার মুকুল

শামস্ জহির

প্রকাশক ঃ

স্বাধীনতা কেন্দ্র
বিজয়নগর, ঢাকা।

এই বইয়ে প্রকাশিত নিবন্ধগুলো অনুমতি ছাড়াই
যে কেউ হুবহু প্রকাশ করতে পারবেন

মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা

www.pathagar.com

ওরা ১১জন

কথিত বুদ্ধিজীবীদের স্বরূপ সন্ধানে

শামস্ জহির

স্বাধীনতা কেন্দ্র

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবীদের স্বরূপ সন্ধানে

পাকিস্তান আমলে আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের অনেকেই সাহিত্যকে সাংস্কৃতিক শুদ্ধতা কিংবা জীবনের অঙ্গীকার হিসেবে নেয়ার পরিবর্তে শাসক গোষ্ঠীর স্তবগানে কিংবা 'সরকারী যুপকাষ্ঠে বলি' হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন।

পাকিস্তান আমলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির চূড়ান্ত অসদ্ভাব ঘটে আইয়ুবের প্রথম মার্শাল ল' প্রবর্তনের পর। এ সময় তিনি গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে স্বৈরতন্ত্র চালুর জন্য এক নতুন মতবাদ চালু করেন; এ নতুন আদর্শের নাম দেন 'মৌলিক গণতন্ত্র'। তার উদ্ভাবিত ইতিহাসের এ নিকৃষ্টতম মতবাদ 'মৌলিক গণতন্ত্র' প্রচারে অংশ নেন দেশের কতিপয় কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা। এসময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলে সরকারের এই নব্য মতবাদ প্রচারে বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীদের বক্তৃতা দেয়ার জন্য পাঠান হতো। মৌলিক গণতন্ত্রের সাফাই গেয়ে কবি-সাহিত্যিকদের অনেকেই কবিতা, গল্প, নাটক রচনা করেন; এ উদ্যোগকে আরো কার্যকর করার জন্য সরকার 'রাইটার্স গিল্ড বা লেখক সংঘ' গঠন করেন। এ সময় কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে লেখক সংঘের সদস্য হওয়ার জন্য বিপুল সাড়া পড়ে যায়। এ সংঘ থেকে লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশের অর্থানুকুল্য, জীবন বীমা ও বাসস্থানের জন্য প্লট, বিদেশ ভ্রমণ এবং পারিতোষিক-সুযোগ সুবিধার আশ্বাস দেয়া হয়।

লেখক সংঘের পক্ষ থেকে উর্দুতে 'পাক জমহুরিয়াত' ও বাংলায় 'পরিক্রম' নামে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এসব পত্রিকায় এতদঞ্চলের ডান-বামপন্থী লেখকরা একত্রিত হয়েছিল। লেখক সংঘের সদস্য পদ সাংবাদিকদের জন্যও উন্মুক্ত ছিল। লেখক সংঘের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করাচীতে হোটেল মেট্রোপলে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৯ সালে।

সেদিন যারা অধিক পয়সার লোভে আইয়ুব খানের দালালী করেছিলেন, আইয়ুবের আইয়ুবনামা অনুবাদ করেছিলেন তারা আজ স্বাধীন বাংলাদেশে রাতারাতি ভোল পাল্টে শরণার্থী হয়ে মস্ত বড় দেশপ্রেমিক বাঙালী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় হলেন এবং পাকিস্তানের বেনিয়া-শাসক গোষ্ঠীর মুন্ডপাত করতে আরম্ভ করলেন, বাঙালী জাতীয়তাবাদী বলে নিজেদের জাহির করে বেড়ান, 'মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি' বলে মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। আবার অনেকে '৭১ এর স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নামে আদালত নিজ হাতে তুলে নিয়ে 'দেশদ্রোহীর' ভূমিকায় নেমে পড়েন। এসব পার্শ্বপরিবর্তন কিভাবে হলো-তা ভাববার বিষয়। অথচ এরাই '৭১ এর পূর্বে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর তুষ্টির জন্য নিজেদের উৎসর্গ করতে ব্যস্ত ছিলেন। আজ তারাই মুখোশ পাল্টিয়ে হয়েছেন ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে মুনীর চৌধুরী, শওকত ওসমান, সৈয়দ শামসুল হক, কবি শামসুর রাহমান প্রমুখ লেখকরা ভারতকে বাক্যবানে হারিয়ে দেয়ার জন্য কষে হিন্দুনিন্দা করেছিলেন। এসময় প্রগতিশীল কবি শামসুর রাহমান লিখেছিলেনঃ

www.pathagar.com

'আজ নয় দ্বিধা আজ নয় কোনো শোক
অগ্নিশপথে জ্বলে অগণিত চোখ
শুধিতেই হবে মাতৃভূমির ঋণ।'

পশ্চিম পাকিস্তানের খেমকারান সেক্টরে ভারতের বিপর্যয় হলে তখন শামসুর রাহমান লিখেছিলেনঃ

'এই দিন চিরদিন জনতার চোখে জ্বলবে
সোনা ঝরা আগামীর রূপময় কথা বলবে।'

এছাড়াও পাক-ভারত যুদ্ধের সময় সীমান্ত এলাকার হুদায়রা গ্রামের মসজিদের বৃদ্ধ ইমাম সাহেব সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ফলে একজন ভারতীয় সৈনিক পরপর তিনটি গুলি করে তাকে হত্যা করেছিল। এই ঘটনা নিয়ে কবি শামসুর রাহমান তৎকালীণ সরকারী প্রেস ট্রাষ্টের পত্রিকা মাসিক 'মাহেনও' পত্রিকায় (অগ্রহায়ন ১৩৭২) 'তিনটি গোলাপ' নামে একটি উত্তম রসোত্তীর্ণ কাব্য-নাট্য লিখেছিলেনঃ

এই মসজিদের দেয়াল হিংসার কর্কশ স্বর
কিংবা কোনো অস্ত্রের ঝঞ্জানা শুনতে অভ্যস্ত নয়।
এর প্রতি ইটে গুঞ্জরিত মৈত্রী, সখ্য ভালবাসা,
মিনারে মিনারে ধ্বনিত শান্তির বাণী
বুঝেছ সৈনিক?

সেই কবি শামসুর রাহমান '৭১-এর স্বাধীনতার পর কলকাতায় গিয়ে নিজ দেশ রাজধানী ঢাকাকে ভর্ৎসনা করে কলকাতার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে বলেনঃ

'আমার শহর তালিমারা জামা পরে নগ্ন হাঁটে, খোঁড়ায় ভীষণ। এখনও সেখানে গণতন্ত্রহীনতা, ধর্মব্যবসা, কুসংস্কার তার বিশ্রী ঘনছায়া আমার স্বাধীনতার গর্ব খাটো করে দেয় অহর্নিশ। কারণ ও শহর দিবারাত্র পীরের দুয়ারে ধর্ণা দেয়, রাত্রিদিন করে রক্তবমি। কলকাতা আমার কাছে নিউইয়র্কের মত। প্রথম আলাপে জড়তা থাকে। জঞ্জাল দেখলে হয় মন খারাপ। কিন্তু তেরাত্রি কাটলেই কলকাতা আমার প্রেমিকা হয়ে যায়। আমি যথার্থ পাই এর সাংস্কৃতিক স্পন্দন (দৈনিক আজকাল, কলকাতা ২৪ অক্টোবর ১৯৮৬)।'

আরেক বুদ্ধিজীবী পরিচয়ধারী আবদুল গাফফার চৌধুরী, তিনি কলকাতার এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় বলেছিলেন-'একটি সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদী হামলা দ্বারা দুই বাংলার সংস্কৃতির ব্যবধানের দেওয়াল ভেঙ্গে দিতে হবে'। (দৈনিক আজাদ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ 'মর্দে মুমিন' কলামে উদ্ধৃত) অথচ পাকিস্তান আমলে ভাষা আন্দোলনের পর পরই 'মুসলিম স্বাতন্ত্রবাদ'-এর রূপকার হিসেবে সরকারী মাসিক মাহেনও নভেম্বর '৫২ সংখ্যায় 'অধিকার' শীর্ষক কবিতায় লিখেছিলেনঃ

মুসলিম সেনা হয়েছে বিজয়ী বসরার অভিযানে,
গাজীরা আসিল গণিমত লয়ে ফিরিয়া মদীনা-পানে,
এক ছড়া মোতিহার

www.pathagar.com

বয়তুল মালে এসে হ'ল জমা-জাতীয় সে ভাণ্ডার।
আলী মুর্তজা খলীফা তখন মুসলিম জাহানের
দীন বেশে থাকি দিন গুজরান করে আল্লার শের।
প্রজাপুঞ্জের ধন ও প্রাণের খলীফা জিম্মাদার,
ধনাগারে আছে যত ধনরাশি প্রজারা মালিক তার
প্রজাদের কল্যাণ
সাধিতে খরচ হবে সেই ধন-ইসলামী ফরমান।

এই সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা গর্ত থেকে শেয়ালের বের হবার মতোই স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধার হক্কা হুয়া আওয়াজ তুলে নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধারে মেতে উঠে মুক্তিযুদ্ধের মর্যাদাকে খাটো করছেন।

ভাগ্যের কি পরিহাস, সেই কবি-সাহিত্যিকেরা এখন ভারতীয় পন্ডিতদের সার্টিফিকেট এনে বাংলাদেশে আসন পোক্ত করার জন্য কবি শামসুর রাহমান আর সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরীর মতই কোলকাতায় ছুট দেন।

বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশের গণমুক্তি সংগ্রামে কোন সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রাখেননি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কোলকাতায় গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে মুক্তিসংগ্রামী হিসবে সকলের সামনে পরিচয় দেন। আর পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতের বুদ্ধিজীবীদের সামনে যে পরিচয় রেখে এসেছেন তা আমাদের জাতির জন্য চূড়ান্ত লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয়। সেখানে বুদ্ধিজীবীরা কে কার চাইতে লোভী এবং গবেট প্রমাণ করবার জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন।

আরেক মুজিববাদী বুদ্ধিজীবী এবং সত্তরের দশকের বাঙালী জাতীয়তাবাদের অন্যতম মুখপত্র ডক্টর মযহারুল ইসলাম পাকিস্তান আমলে ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছিলেন-

'ইকবাল পাকিস্তানের প্রথম স্বাপ্নিক কবি। তাই প্রত্যেক পাকিস্তানীর কাছে ইকবাল জাতীয় কবি। আমরা শ্রদ্ধার সাথে তাকে স্বরণ করি। কবি রবীন্দ্রনাথকে জাতীয় কবি বলবার ধৃষ্ঠতা আমার নেই' (সাহিত্যের পথে পৃঃ ১১৬)।

অথচ এদের প্রচেষ্টায় স্বাধীনতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি ইকবাল হলের নাম পাল্টিয়ে জহুরুল হক হল করা হয়। একইভাবে জনাব মযহারুল ইসলাম জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্বসহ ধর্মীয় রাষ্ট্রের বিরোধিতা করে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রসব করে চলেছেন (যেমন- জিন্নাহর উল্টো দৌড়ঃ সামাজিক এবং রাজনৈতিক বীক্ষন, আজকের কাগজ ২৯ জুলাই '৯১)।

অথচ তিনি এক সময় জিন্নাহকে নিয়ে কবিতা রচনা করে বলেছিলেন ঃ

যে এনেছে বুক জুড়ে আশ্বাস
যে দিয়েছে সত্তা নিয়ে বাঁচবার বিশ্বাস
অগণন মানুষের হৃদয় মঞ্জিল সে আমার কায়েদে আজম
আমার তন্ত্রীতে যার ঈমানের একতার
শৃংখলার উঠিছে ঝংকার
সুন্দর মধুর মনোরম

www.pathagar.com

৬

[স্রষ্টার প্রতি/মাটির ফসল]
আমার রক্তের মাঝে তবু তার স্পন্দন
আমার মাটিতে বুকে তবু তার শিহরণ
কান পেতে শুনি প্রাণ ভরে
স্বপ্নের পৃথিবীর মোর আমার পায়ের নিচে
দাঁড়িয়েছে অপূর্ব রূপ ধরে
সে পৃথিবীর ভালোবাসি
আর তার স্রষ্টারে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি তাই
তাঁরই স্মরণ করি অর্ঘ রচনা করে যাই।
[তাঁরই স্মরণ করি/মাটির ফসল]

এমনি নির্লজ্জ বৈপরীত্য বোধকরি পৃথিবীর অন্য কোন দেশে বুদ্ধিজীবীর মধ্যে লক্ষ্য করা যাবে না। বরং যে যা বিশ্বাস করেছেন, শত বিপত্তির মধ্যেও সেই বিশ্বাসকে আকড়ে থেকেছেন। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে যে বুদ্ধিজীবী/ কবি ১৯৭১ সালে পর্যন্ত পাকিস্তানের পক্ষে কলাম লেখে, পাক সরকারের চাকুরী করে সেই তিনিই কিভাবে ১৬ ডিসেম্বর '৭১-এর পর খাস মুক্তিযোদ্ধা সেজে যান?! এবং আতঙ্কের বিষয় হলো এরাই আজ 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র দাবীদার, অকৃত্রিম অসাম্প্রদায়িক! বিশেষ করে একশ্রেণীর মিডিয়ার কল্যাণে এরা অনেকের চোখে মুক্তিযুদ্ধের প্রতীকে পরিণত হয়েছেন।

কিন্তু নতুন প্রজন্মকে জানতে হবে এদেশ, এ মাটি, এদেশের মানুষের প্রতি এসব বুদ্ধিজীবীর কোন অঙ্গীকার নেই, দায়বদ্ধতা নেই। তারা একসময় ছিল পাক দালাল, এখন ভারত বন্দনায় মুখর।

এদের থেকে হুঁশিয়ার, সাবধান।

www.pathagar.com

কে এই শাহরিয়ার কবির

পিতাঃ সিদ্দিক উল্লাহ। জন্মস্থান ও জন্মতারিখ ঃ ৫ নবরায় লেন, ইসলামপুর, ঢাকা, ২০ নভেম্বর ১৯৫০। স্থায়ী ঠিকানা ঃ মজুপুর, সোনাগাজী, ফেনী। বর্তমান ঠিকানা ঃ গ ১৬, মহাখালী, ঢাকা-১২১২। পেশা ঃ সাংবাদিকতা (সাপ্তাহিক বিচিত্রার নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন), বর্তমানে ঘাদানি কমিটির আহবায়ক।

শাহরিয়ার কবির কোথায় মুক্তিযুদ্ধের করেছেন :

প্রশ্ন কর্নেল নূরুজ্জামানের

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার লে. কর্নেল (অবঃ) কাজী নুরুজ্জামান বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়ে আমাদের মধ্যে যে হতাশা সৃষ্টি হয়েছে তার পেছনে মূল কারণ হল গোড়ার গলদ। মুক্তিযোদ্ধাদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি, তাদেরকে পরিকল্পিতভাবে হেয় করা হয়েছে এবং যারা মুক্তিযুদ্ধ করেনি তারাই সমাজের সব জায়গা দখল করে নিয়েছে। এমন হাজারটা উদাহরণ দেয়া যায়, সর্বশেষ উদাহরণ হল সাংবাদিক লেখক শাহরিয়ার কবির। তিনি কোথায় যুদ্ধ করেছেন তা কোনভাবেই জানতে পারিনি। কিন্তু সাম্প্রতিককাল তাকে এত বড় করে দেখানো হচ্ছে যাতে মনে হয় শাহরিয়ার করিব মুক্তিযুদ্ধের প্রতীকে পরিণত হয়েছেন।

তিনি বলেন, শাহরিয়ারকে আমি ছেলের মতো স্নেহ করি, আমরা একসঙ্গে বহুদিন কাজ করেছি, বিশেষ করে '৭১এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিতে। কিন্তু যখনই জানতে চেয়েছি সে কোথায় যুদ্ধ করেছে তখনই সে নিশ্চুপ থেকেছে, কোনদিন সদুত্তর দেয়নি। সম্প্রতি তাকে এত বড় করে দেখানো হচ্ছে, যে, সে মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক হয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে, তাই ভাবলাম কবির কোথায় যুদ্ধ করেছে খোঁজ নেয়া দরকার। তার বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করে কিছু জানা গেল না। তার আত্মীয়দের কাছে জানতে চেয়ে দেখা গেল কেউ কিছু জানে না। (দৈনিক যুগান্তর ১০ ফেব্রুয়ারী ২০০২ সংখ্যা)

লেখক ও সাংবাদিক পরিচয়ের আড়ালে শাহরিয়ার কবির দেশের ভেতরে এবং বাইরে বাংলাদেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। গত ২২ নভেম্বর ২০০১ বাংলাদেশ বিরোধী কর্মকান্ডের বিভিন্ন ডকুমেন্টসহ জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। কলকাতা থেকে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে আগমনের পরপরই কাষ্টমস কর্তৃপক্ষ শাহরিয়ার কবিরের মালামাল তল্লাশি করে ৪টি বেটাকম ভিডিও ক্যাসেট, ১টি ভিএইচএস ভিডিও ক্যাসেট, ১০টি অডিও ক্যাসেট এবং ৩টি সিডি পায়। এগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী তথ্য, বক্তব্য, চিত্র পাওয়া যায়। শাহরিয়ার কবির অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে দুরভিসন্ধিমূলকভাবে বিভিন্ন ভিডিও ফিল্ম তৈরী করেন। এসব ভিডিও ফিল্মে পরিকল্পিতভাবে আদায়কৃত সাক্ষাৎকারে তিনি বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীত নষ্ট করারও অপচেষ্টা চালিয়েছেন। শাহরিয়ার কবির এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি মহল

www.pathagar.com

পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী দেশ প্রমাণ করার জন্য বিদেশে প্রচারণা চালায়-এতে দেশের সুনাম ক্ষুন্ন করার হীন চেষ্টা এবং বাংলাদেশ বিরোধী তাদের কর্মকান্ড সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গত ২২ নভেম্বর শাহরিয়ার কবিরকে আটক করা হলেও এই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিনি একটি প্রতিবেশী দেশে গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করছেন একদশকেরও বেশী সময় ধরে। একাজ করার জন্য তিনি নিজের ব্যক্তিপরিচয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক সাংবাদিক ইমেজ ব্যবহার করেন। যদিও শাহরিয়ার কবির মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না। সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধে সেক্টর কমান্ডার কর্নেল নুরুজ্জামান-সংবাদ পত্রকে জানিয়েছেন শাহরিয়ার কবির মুক্তিযোদ্ধা নন। তিনি শাহরিয়ার কবির সম্পর্কে বলেছেন যে শাহরিয়ার কবির কোন সেক্টরের কোথায় যুদ্ধ করেছেন-তাঁর প্রমাণ দিতে হবে। স্পষ্ট করেই কর্ণেল নুরুজ্জমান জানিয়েছেন-শাহরিয়ার কবির মুক্তিযোদ্ধা নন, অথচ নিজেকে মহামুক্তিযোদ্ধা হিসাবে প্রচার করছেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে কর্ণেল নুরুজ্জামানের এ বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। শাহরিয়ার কবির যে ধুরন্ধর তা তাঁর ব্যাপারে খোঁজ নিলেই জানা যাবে। তাঁর এই রাজনৈতিক ধূর্ততার বিবরণ তুলে ধরে দৈনিক মানব জমিন একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে সেই রিপোর্টেই বোঝা যায় শাহরিয়ার কবির ব্যক্তিটিকে। মানব জমিনের সেই রিপোর্টটি হুবহু এখানে তুলে ধরছি।

বঙ্গবন্ধুকে যিনি বলতেন জনশত্রু

বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে তিনি ছিলেন পিকিংপন্থী। চৈনিক বিপ্লবের 'অমোঘ সম্ভাবনা'র কথা জানাতে এবং অগ্নিস্ফুলিংগের বিদ্যুৎচ্ছটা সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে তিনি লিখেছিলেন-ওদের জানিয়ে দাও। বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ ছিল তার দৃষ্টিতে জনশত্রু। নাম শুনলেই কানে দিতেন সিসে। গোটা সত্তর দশক, আশির শেষ অবধি ছিলেন এই ইমেজেই বন্দি। তারপর ইয়ার বন্ধু রাজনৈতিক সহকর্মী, সহমর্মী সবাইকে অগ লাগিয়ে দিয়ে বদলে ফেললেন খোলনলচে। বিচিত্রা বন্ধ হয়ে গেল। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতৃত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে হাঁটতে শুরু করলেন, চিরপরিচিত পথের ঠিক উল্টোদিকে। সবাই জানলেন, এক সময়কার জনশত্রু দলটির তিনি সহমর্মী। আর তাই প্রবীণ নেতা কাজী জাফর তাকে দেখে জানতে চাইলেন সহাস্যে কিহে শাহরিয়ার, ছাতা ঘুরিয়ে ধরলেন নাকি?

একজন শাহরিয়ার কবির। খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু আর সন্ত্রাস ইস্যুকে যিনি এপার বাংলা ওপার বাংলায় (তারা এপার বাংলা ওপার বাংলা বলে থাকেন) আন্দোলনে রূপ দেয়ার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছেন। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনীতিতেও তিনি এখন আলোচিত বিষয়। জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকদের কাছে আওয়ামী লীগের পক্ষে শাহরিয়ার কবিরের এই সংখ্যালঘু মিশন নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার অন্ত নেই। অথচ দেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে শাহরিয়ার কবিরের ভূমিকা ছিল অন্যরকম। পিকিংপন্থী কমিউনিষ্টিদের সমর্থনে এক সময় বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগকে তিনি তুলোধুনো করেছেন। নকশালপন্থীদের দলে ঢুকে পালিয়ে বেড়িয়েছেন গ্রামে গ্রামে। কিন্তু সেই শাহরিয়ার কবিরই নির্বাচনের দিন ফেনী থেকে ফিরে এসে বলেছিলেন সেখানে প্রশাসন

www.pathagar.com

জয়নাল হাজারীকে হারিয়েছে। জয়নাল হাজারীর জনপ্রিয়তায় তিনি মুগ্ধ। ঢাকা থেকে অন্য অনেক সাংবাদিকই ফেনীতে গেছেন পেশাগত কাজে। দেশজুড়ে পরিচিত ওই সন্ত্রাসী গডফাদারের পক্ষে তাদের কারো মুখেই এ ধরনের কথা শোনা যায়নি। এর আগেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষার এক জনসভায় শাহরিয়ার কবির ফেনীতে বক্তব্য রেখেছেন। ভোট চেয়েছেন জয়নাল হাজারীর পক্ষে। এসব দেশের পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। তার এই ভূমিকা বক্তব্য নিয়ে সেসময় আলোচনা-সমালোচনাও কম হয়নি। একটি জাতীয় দৈনিকে লেখা মন্তব্য কলামে শাহরিয়ার কবির বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের সেক্যুলার সিভিল সমাজও একইভাবে বলছে, খালেদা জিয়ার মৌলবাদী তালেবানী' অথচ এক সময় শাহরিয়ার কবিরের ভূমিকা ছিল অন্যরকম। সেসময় তিনি নিয়মিত লিখতেন সাপ্তাহিক বিচিত্রায়, সম্পাদনাও করতেন পত্রিকাটি। তার আলোচিত বেশ কয়েকটি লেখায় তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আক্রমণ করেন। আওয়ামী লীগের নেতারাও তার লেখায় সেই সময় রোষের শিকার হন। '৭৪ সালের নভেম্বর মাসে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত শাহরিয়ার কবিরের 'ওদের জানিয়ে দাও' শিরোনামের লেখাটিতে বলা হয় স্বাধীনতা যুদ্ধের পর আওয়ামী লীগের বড় নেতারা দেশ থেকে ভারতে কোটি কোটি টাকার পাট, ওষুধ পাচার করছে। দেশের দরিদ্র মানুষদের রক্ত চুষে তারা ইন্ডিয়ান ব্যাংকে টাকা জমাচ্ছে। তেমন আওওয়ামী লীগ নেতাদের খতমের কথাও বলা হয়। সেই শাহরিয়ার কবিরের এখনকার ভূমিকা নিয়ে নানা কথা বলছেন রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীরীরা। সম্প্রতি শাহরিয়ার কবিরের লেখায় ইস্যু হয়ে গেছে 'সংখ্যালঘু'। কথিত এই ইস্যুতে তিনি শাপ-শাপান্ত করে চলেছেন বর্তমান সরকার, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীকে। একই বিষয় সামনে রেখে তিনি সংখ্যালঘুদের অধিকার ও নিরাপত্তা আদায়ে ছুটে গেছেন ভারতে। ঘুরছেন সেদেশের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে। কলকাতায় প্রকাশিত একটি বাংলা দৈনিকের রিপোর্টে বলা হয়েছে-এপার থেকে যাওয়া কয়েকজন বুদ্ধিজীবী কলকাতায় বসে পশ্চিমবঙ্গে 'বাংলাদেশের সংখ্যালঘু' ইস্যুকে উত্তপ্ত করার আয়োজন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের দেয়া নানা তথ্য নিয়েই বহরমপুর, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, বালুঘাট এলাকায় বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া সংখ্যালঘুদের আশ্রয়কেন্দ্র খোলার খবরও কয়েকদিন আগে ফলাও করে ছাপা হয়েছে। কিন্তু কলকাতায় কর্মরত বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশন অফিস থেকে সরেজমিন অনুসন্ধান করে বাংলাদেশে যে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে তাতে বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের কোথাও এ ধরনের কোন 'বাংলাদেশী সংখ্যালঘু' আশ্রয়কেন্দ্র নেই। বাংলাদেশ পররাষ্ট্র দফতরে আসা বিভিন্ন রিপোর্টে অভিযোগ এসেছে শাহরিয়ার কবির ভারতে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ইস্যু নিয়ে কাজ করছেন। এর আগে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ইস্যু নিয়ে কাজ করতে গিয়ে শাহরিয়ার কবির প্রথম প্রকাশ্যে আসেন গত অক্টোবরের প্রথম দিকে। তখন উল্লাপাড়া থেকে পূর্ণিমা রানী নামের এক মেয়েকে আনা হয় ঢাকায়। শাহরিয়ার কবির তাকে নিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন। 'সংখ্যালঘু হিসেবে নির্যাতিতা' পূর্ণিমা বেশ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সংবাদ শিরোনাম হয়। উল্লাপাড়ার পূর্ব দেলুয়া গ্রাম থেকে ২০ অক্টোবর পূর্নিমাকে ঢাকায় আনেন শাহরিয়ার কবির। থানায় দায়ের করা

www.pathagar.com

এজাহার অনুযায়ী সংবাদ সম্মেলনে তার উপর নির্মম পাশবিক নির্যাতন-ধর্ষণের বর্ণনা দেন। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। কিন্তু মানবজমিনের সরেজমিন অনুসন্ধানে প্রমাণ মিলেছে সংখ্যালঘু হিসেবে গ্রাম্য মাস্তানদের নির্যাতন ধর্ষণের শিকার হননি পূর্ণিমা। ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন ও উল্লাপাড়া থানায় তার দায়ের করা মামলায় দেয়া বর্ণনার সাথে গ্রামবাসীদের বক্তব্যেরও পাওয়া গেছে ব্যাপক গরমিল। পূর্ণিমার পড়শিরা জানিয়েছে সংখ্যালঘু নির্যাতন নয় পূর্ণিমার ওই ঘটনাটি ছিল পারিবারিক পূর্ব শত্রুতার মারামারি। শাহরিয়ার কবির ঢাকায় আনার পর পূর্ণিমার পরিবারকে নগদ টাকা দিয়েছেন একথাও ওই পরিবারের লোকজন স্বীকার করেছেন। দেশের বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই শাহরিয়ার কবিরের এই ভূমিকাকে বলছেন 'বিশেষ মিশন'। মানবজমিনের সাথে আলাপকালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদও জানালেন অভিন্ন প্রতিক্রিয়া। তিনি বলেন, এখন শাহরিয়ার কবিরের ভূমিকা দেখে অবাক হই। এক সময় তার পরিচয় ছিল পিকিংপন্থী কমিউনিষ্ট। এখন সে দেখি আওয়ামী লীগের সুরে কথা বলে। পত্র-পত্রিকায় কলাম লেখে। কয়েকদিন আগে আড়ং-এ তার সাথে দেখা হলো। প্রশ্ন করলাম ছাতা ঘুরিয়ে ধরলেন নাকি? তিনি জবাব দেননি। আসলে সময় কখন যে কাকে কিভাবে পাল্টে দেবে তা কল্পনাও করা যায় না। কাজী জাফর আহমদও একসময় পিকিংপন্থী কমিউনিষ্ট রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। শাহরিয়ার কবির এবার সংসদ নির্বাচনের আগে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে মন্তব্য কলাম লিখেছেন। আকারে ইঙ্গিতে ওইসব লেখায় তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ১ অক্টোবরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে হারানোর কেউ নেই। দেশের পত্র-পত্রিকাগুলোর রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা গেছে, এবার সংসদ নির্বাচনের আগেই শাহরিয়ার কবিরের আওয়ামী লীগ প্রীতি প্রকট হয়ে ওঠে। বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিত শাহরিয়ার কবিরের জীবনী ঘেঁটে দেখা যায় '৭২ সালের শেষ দিকে তিনি যোগ দিয়েছেন মতিন-আলাউদ্দিনের নকশালপন্থী দলে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন মতিয়া গ্রুপের ছাত্র ইউনিয়নের সাথে। '৬৬ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি যখন মস্কো ও পিকিং দুই শিবিরে ভাগ হয়ে যায় তখন শাহরিয়ার কবির পিকিংপন্থীদের সাথে ভিড়ে যান। '৭৪ সালে তার লেখা 'ওদের জানিয়ে দাওতে নকশালপন্থীদের নিয়ে অভিজ্ঞতার কথাই প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি '৬৮-৬৯ সালে প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। তার নির্বাচিত রচনাবলী গ্রন্থে তিনি নিজেই লিখেছেন. '৭১ এ যুদ্ধে যাব বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। সাত নম্বর সেক্টরেও ছিলাম কিছুদিন। রাজশাহীতে অপারেশনেও অংশ নেই। কিন্তু জহির রায়হান আমাকে কলকাতা থেকে ডেকে পাঠান। বলেন, কালচারাল স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে, ছবি তৈরি হচ্ছে কলকাতাতেই থাকতে হবে। বিশিষ্ট লেখক ছাড়াও ৫১ বছর বয়সী শাহরিয়ার কবিরের পরিচিতি একাধারে মুক্তিযোদ্ধা, চলচ্চিত্রকার, প্রাবন্ধিক, উপন্যাসিক, কলামিষ্ট, সংগঠক হিসেবে। সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনে তিনি সব সময়ই সোচ্চার থেকেছেন। কলম ধরেছেন। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের মৃত্যুর পর তিনি ২ বছর একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির অস্থায়ী আহবায়কের দায়িত্ব পালন করেন।

www.pathagar.com

শাহরিয়ার কবিরের মূল মিশন হচ্ছে বাংলাদেশের সীমানা মুছে ফেলা। ভারতীয় সম্প্রসারনবাদী নীতি বাস্তবায়নে বাংলদেশে চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র চালানো, মিথ্যা প্রচারণা, রাজনৈতিক গোলযোগ, জনগনের মধ্যে বিভেদ, আস্থাহীনতা ও হানাহানি সৃষ্টি করে বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিপন্ন করা এবং একটি রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের পক্ষে প্রচারণা ও জনমত গঠন করা। যাতে বাংলাদেশ সিকিমের ভাগ্যবরণ করে। অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষতার নামে শাহরিয়ার কবির ও তাঁর সহযোগীরা এই সুরে বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্খা, চিন্তা ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ব্যাপক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডসহ দেশের ভেতরে ও বাইরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মহলে প্রচারণা চালাচ্ছে। শাহরিয়ার কবিরের কাছ থেকে ক্যাসেট আটকের পর বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার লোকরা বিস্মিত এবং হতবাক হয়েছেন। শাহরিয়ার কবিরের সঙ্গে বহন করে আনা ক্যাসেটে রয়েছে কথিত 'স্বাধীন বঙ্গভূমির প্রামান্য চিত্র'। এই বঙ্গভূমি আন্দোলনের নেতা আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি চিত্তরঞ্জন সুতার। এই সংগঠনের অফিস কোলকাতা এবং বঙ্গভূমি আন্দোলনের অঙ্গ সংগঠন হচ্ছে নিখিলবঙ্গ নাগরিক সংঘ। এই সংগঠনের লক্ষ্য ও কর্মতৎপরতা নিয়ে ভিডিওতে রয়েছে 'সীমারেখা মানছি না, মানবো না' শ্লোগান। এসব ভিডিও দেশে বিদেশে প্রচার তৎপরতার নেতৃত্ব দিচ্ছেন শাহরিয়ার কবির। শুধু বাংলাদেশ বিরোধী চক্রান্তই নয়। উপমহাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে তার চিন্তা, লেখালেখি ও তৎপরতা সবই একজন ভারতীয় আর্মি ইনন্টিলিজেন্স ও ডিপ্লোমেটের। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিই শাহরিয়ার কবিরের দৃষ্টিভঙ্গি। ভারত পাকিস্তান এবং কাশ্মীর সফর করে এদেশের একটি ভারতপন্থী পত্রিকায় ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে উপমহাদেশের রাজনীতির ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। শাহরিয়ার কবির মনে করেন-কাশ্মীরে স্বাধীনতা আন্দোলন নয়; ভারতীয়দের মতো তিনিও মনে করেন, কাশ্মীরে চলছে বিচ্ছিন্নতাবাদ। শাহরিয়ার কবির কাশ্মীরের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লিখে যাচ্ছেন। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক, ঘনঘন ভারত সফর, ভারতের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উঁচু ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং অঢেল বিত্তের মালিক হওয়া-এসব কিছুর পেছনে একটিই কারণ - শাহরিয়ার কবির বাংলাদেশে ভারতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সক্রিয় চেষ্টা চালাচ্ছেন।

রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে পুলিশ ঘাদানিক নেতা শাহরিয়ার কবিরকে গ্রেফতার করায় দিশাহারা হয়ে পড়েছেন মেজর জেনারেল (অবঃ) সি আর দত্ত, সুধাংশু শেখর হালদার, অধ্যাপক ললিত মোহন নাথ, ডঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, ডঃ নিমচন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ নেতারা এবং তাদের কাউন্টার পার্ট কবীর চৌধুরী, মুনতাসীর মামুন, রামেন্দু মজুমদার, আনিসুজ্জামান প্রমুখ ঘাদানিক নেতা ও ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীরা। শাহরিয়ার কবিরকে আটকের পর পুলিশ ভাষ্যে যা বেরিয়ে এসেছিল তা মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ

১. বাংলাদেশের মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর ভয়ঙ্কর নির্যাতন করছে এটা প্রতিষ্ঠিত করার অ্যাসাইনমেন্ট নিয়েই শাহরিয়ার কবির গত ১১ নভেম্বর কোলকাতা গমন করেন।

২. কোলকাতায় তার সহযোগী হন আগেই দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়া হাসান ইমাম।

www.pathagar.com

সম্ভবতঃ গডফাদার জয়নাল হাজারী ও শামীম ওসমান প্রমুখ।

৩. শাহরিয়ার কবির বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা সফর করে এবং কোলকাতার কিছু লোককে মুসলমানদের অত্যাচারে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা হিন্দু সাজিয়ে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক বর্বরতার ভিডিও চিত্র তৈরী করেন।

৪. এসব ভিডিও ক্যাসেট কোলকাতার রবীন্দ্র সংসদ, বাংলা একাডেমী, নন্দন থিয়েটার, কোলকাতা ক্লাবসহ বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন করা হয়, যাতে ভারতীয়রা বুঝতে পারে যে, বাংলাদেশের মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর কি ভয়ঙ্কর নির্যাতন চালাচ্ছে। এই ক্যাসেটের কপি নাকি জাতিসংঘ সদর দফতরেও পাঠিয়েছেন শাহরিয়ার কবির।

৫. এছাড়াও শাহরিয়ার কবির রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র সদনসহ বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত ১৭টি সভায় বক্তৃতা করেন এবং বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের বিশদ বর্ণনা প্রদান করেন।

৬. ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি বেশ কিছু গোপন বৈঠকেও অংশগ্রহণ করেন। বৈঠক করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বঙ্গভূমি আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গেও।

৭. শাহরিয়ার কবির বাংলাদেশ থেকে কোলকাতায় গমনকারী সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের কল্পকাহিনী ফেঁদে একটি উস্কানিমুলক চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রস্তুতিসহ রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন, একথা জানতে পেরে কোলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশন ঢাকাকে এ ব্যাপারে অবহিত করে।

৮. এমতাবস্থায় শাহরিয়ার কবির গত ২২ নভেম্বর বিজি ০৯৬ ফ্লাইটযোগে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানন্দরে এসে পৌছলে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। তাঁর মালামাল তল্লাশি করে পাওয়া যায় ৪টি বেটাকম ভিডিও ও ৩টি সিডি। এই সব ক্যাসেটের মধ্যে রয়েছে স্বাধীন বঙ্গভূমি সংক্রান্ত ক্যাসেটও।

৯. ৪টি ভিডিও ক্যাসেটের প্রতিটি ১২০ মিনিটের। বেটাকম ক্যাসেটটি বাংলাদেশের একটি বিতর্কিত টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। এছাড়া শাহরিয়ার কবির কোলকাতার কয়েকটি বেসরকারী চ্যানেল থেকেও এসব ক্যাসেট সম্প্রচারের ব্যবস্থা করে এসেছিলেন।

১০. শাহরিয়ার কবিরকে আটক করার খবর পাওয়া মাত্র ভারতীয় হাইকমিশনের একজন কাউন্সিলর, যিনি প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর আন্ডার কভার ষ্টেশন চীফ, শাহরিয়ার কবিরকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য বিমানবন্দরে ছুটে যান এবং সংশ্লিষ্ট অফিসারদের মোটা অংকের ঘুষ অফার করেন। এছাড়া একজন অভিনেতা যিনি এবার আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে এমপি নির্বাচিত হয়েছেন, তিনিও শাহরিয়ার কবিরকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য জোর তৎপরতা চালান।

শাহরিয়ার কবিরের ব্যাকগ্রাউন্ডও বেশ বর্ণাঢ্য। ১৯৭১এর মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধকে 'দুই কুকুরের লড়াই' বলে অভিহিত

www.pathagar.com

করেছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি কবীর চৌধুরীদের মতোই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ঘোরতর মিশন-বরদার বনে যান। গত নির্বাচনের পর হাসান ইমাম দেশ থেকে পালিয়ে গেলে শাহরিয়ার কবির ঘাদানিক-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতির গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ইতিপূর্বে গত ৮ নভেম্বর শাহরিয়ার কবির বিবিসির অনলাইনের নিউজ ভার্সানে 'বাংলাদেশে হিন্দু নৃশংসতার প্রমাণাদি সংগৃহীত' শিরোনামে সম্প্রচারিত এক অনুষ্ঠানে বলেন, 'বাংলাদেশী মৌলবাদীরা বলপূর্বক হিন্দুদের বিতারিত করে বাংলাদেশকে একটি নিখাদ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করছে। জোট সরকার ভোটে জেতার পর সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনই শুধু হচ্ছে না, হিন্দু মহিলারা ব্যাপকভাবে ধর্ষণের শিকারও হচ্ছে।'

বস্তুতঃ শাহরিয়ার কবিরদের শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত এবং এদের নেটওয়ার্ক বহুদূর বিস্তৃত। এই নেটওয়ার্কেরই লন্ডনস্থ এজেন্ট 'র'-এর অর্থপুষ্ট আবদুল গাফফার চৌধুরী বলেও অনেকের ধারণা।

এই চক্রটির প্রধান মিশন হচ্ছে বাংলাদেশের ইসলাম অনুসারীদের বিভিন্ন অজুহাত সৃষ্টির মাধ্যমে নির্মুল করে দেয়া, ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও মুল্যবোধকে ধ্বংস করা, প্রতিমা পুজারীদের সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা করা-এক কথায় বাংলাদেশকে অনৈসলামিকীকরণ (De-Islamisation) করা, কেননা ইসলামই বাংলাদেশকে ভারতের আজ্ঞাবসহ দাস রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রধান অন্তরায়।

এই চক্র খুবই সুনিশ্চিত ছিলো যে, ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২০০-এরও বেশী আসনে বিজয়ী হয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে এবং ক্রুট মেজরিটির জোরে এমন সব আইন পাস করিয়ে নেবে, যাতে বাংলাদেশে অনৈসলামিকীকরনেরর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল তাদের ধারণার সম্পুর্ণ বিপরীতে হওয়ায় তারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে এবং ঘটাতে থাকে একের পর এক সাম্প্রদায়িক ঘটনা এবং যথারীতি কালবিলম্ব না করে এর দায়দায়িত্ব চাপাতে থাকে ইসলামপন্থীদের ওপর, এমনকি বিএনপির ওপরও। একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকাও তাদের প্রদান করতে থাকে ব্যাপক কাভারেজ। এক্ষেত্রেও লক্ষণীয় যে, তারা ইসলামীপন্থীদের ও বিএনপিকে দায়ী করছে বটে; কিন্তু একটি ক্ষেত্রেও কোন স্পেসিফিক প্রমাণ হাজির করতে সমর্থ হচ্ছে না। আওয়ামী লীগের পরাজয়ে উন্মুক্ত এই মহলটি সম্ভবত ঃ ভেবেছিলো যে, পরিকল্পিতভাবে ওইসব 'সাম্প্রদায়িক ঘটনা' ঘটালে এবং কিছু 'সংখ্যালঘু'কে ভারত থেকে ঘুরিয়ে আনলে ভারতের বিজেপি সরকার রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যাবেন এবং বাংলাদেশের 'বর্বরোচিত নির্যাতনের শিকার' হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য ভারতীয় ফৌজকে বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দেবেন এবং এই প্রক্রিয়ায় পতন ঘটবে বিএনপি জোট সরকারের। আবার গদিতে আসীন হবেন শেখ হাসিনা; সরকার গঠন করবে আওয়ামী লীগ।

আবদুল গাফফার চৌধুরী, এম আর আখতার মুকুল, মুনতাসীর মামুন প্রমুখের প্রতিটি

www.pathagar.com

লেখায়ও কি এই মর্মই প্রকাশ হয়ে পড়ে না?

কে এই শাহরিয়ার কবির? একজন অজানা-অচেনা মেট্রিকুলেট নবিস সাংবাদিক ছিল এই শাহরিয়ার কবির। ১৯৭২-এর আগ পর্যন্ত এই ব্যক্তিটির না ছিল কোন সামাজিক পরিচিত, না ছিল কোন কৌলিণ্য। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় আধিপত্যবাদী ভারত একদিকে যেমন মুক্তিযুদ্ধকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তার নিজের সামরিক প্রাধান্যের নিয়ন্ত্রণে রেখে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির চরিত্র পাল্টে ফেলবার কাজে কঠোরতার সঙ্গে যত্নবান ছিল তেমনি সম্প্রসারণবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ভারতের শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের রাষ্ট্রদেহে ও সমাজদেহে ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মজালকে বিস্তৃত করে একদিকে ভারতীয় চর নিয়োগীয় সেবাদাসকে রিক্রুটমেন্ট অব্যাহত রাখে। অন্যদিকে ভারতীয় গোয়েন্দা স্থাপনার উদ্যোগে দেশের ভেতরে ভারতীয় পঞ্চম বাহিনী গড়ে তোলার কাজটি সংগোপনে সুচারু ও সুনিপুনভাবে সম্পন্ন করে। এই পঞ্চম বাহিনী আজ সংখ্যা ও আয়তনে অনেক মেদবহুল ও স্ফীত হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও জাতীয় নিরাপত্তাকে যদি নিশ্চিত করতে হয় তাহলে ভারতের চর নিয়োগী সেবাদাস ও পঞ্চম বাহিনীর বিরুদ্ধে একযোগে খোলামেলা সর্বাত্মক জাতীয় লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে হবে। বাংলাদেশ পাকিস্তানী হানাদার মুক্ত হবার অব্যবহিত পরই ভারতীয় দখলদার সশস্ত্র বাহিনীর তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় এবং সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন গ্রন্থিতে ভারতীয় চর ও নিয়োগীদের ঢালাওভাবে অনুপ্রবেশ ঘটে। এমনি একজন গুপ্তচর হচ্ছে শাহরিয়ার করিব। মুক্তিযুদ্ধের আলখেল্লা ধারণ করে সরকারী মালিকানাধীন দৈনিক বাংলা গোষ্ঠীর বিচিত্রা পত্রিকায় এই লোকটি ঢুকে পড়ে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ষাটের দশকের শেষদিক থেকে শুরু করে সত্তরের দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত ভারতীয় শাসকচক্র নকশালপন্থী আন্দোলনের ভয়ে প্রকম্পিত ছিল। নকশাল আন্দোলনের আঁচ ও ঢেউ বাংলাদেশেও এসে পড়ে। সে কারণে ভারতীয় শাসকচক্রের প্রথম লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের বাম আন্দোলনের মধ্যে যারা দেশপ্রেমিক ছিলেন তাদেরকে বিভ্রান্ত ও খতম করা। এই উদ্দেশ্যেই ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা শাহরিয়ার কবির সরকারী চাকরিতে থেকেও আন্ডারগ্রাউন্ড বাম রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। সীমান্তের ওপার থেকে তথ্য কর্মসূচী ও নির্দেশনামা এনে এদেশের বাম আন্দোলনকে খন্ড-বিখণ্ডকরণের বিনাশী কাজে নিজেকে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করে। এদেশের বাম আন্দোলনের উপদলীয় চক্রান্তে নানা কৌশলে ইন্ধন যুগিয়ে গেছে শাহরিয়ার কবির এবং একেক উপদল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে অন্য উপদলের কাঁধে গিয়ে সওয়ার হয়েছে। দৈনিক বাংলার প্রেসে দৈনিক বাংলার নিউজপ্রিন্ট ব্যবহার করে বাম রাজনীতির পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রচারপত্র বিনি পয়সায় গোপনে ছেপে বাহাদুরী কুড়াতেও এই ব্যক্তিটির বিবেকে লাগেনি। ১৯৭৩-এর জানুয়ারীতে ভিয়েতনাম সংহতি মিছিলে আওয়ামী ফ্যাসিষ্ট চক্র গুলীবর্ষণ করলে সারাদেশে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। সে সময় আওয়ামী ফ্যাসিষ্টরা জাতীয় প্রেস ক্লাবের পেছনে অবস্থিত মুজাফফর ন্যাপের কেন্দ্রীয় কার্যালয়টি জ্বালিয়ে দেয়। মুজাফফর ন্যাপের তৎকালীন নেত্রী মতিয়া চৌধুরী

www.pathagar.com

যিনি বর্তমানে আওয়ামী লীগের নিষ্ঠাবান সেবিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের প্রতিবাদ সভায় শেখ মুজিবের প্রতি ধিক্কার জ্ঞাপন করে বলেছিলেন, 'তুমি আর বঙ্গবন্ধু নও'। আজ থেকে তুমি বঙ্গশত্রু।' সেই সময় শাহরিয়ার কবির গলাবাড়িয়ে আরও একধাপ উচ্চস্বরে লিখে বসলো, মুজিব আর বঙ্গবন্ধু নয়, এখন থেকে মুজিব জনশত্রু। এহেন শাহরিয়ার কবির এখন মুজিব প্রেমে বিভোর। উঠতে-বসতে মুজিবের নামে তসবিহ না টিপলে এই ব্যক্তিটি মনে করে সে কবিরা গুনাহ করে ফেলেছে। বাম রাজনীতির ঢঙ্কা বাজাতে গিয়ে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও আধিপত্যবাদকে গালাগাল করতে যে ব্যক্তিটি লবেজান ছিল সেই ব্যক্তি এখন পরম ভারত প্রেমী।

www.pathagar.com

আবদুল গাফফার চৌধুরী

পিতা ঃ ওয়াহেদ রেজা চৌধুরী, জন্মস্থান ও জন্মতারিখ ঃ উলানিয়া, বরিশাল, ১২ ডিসেম্বর ১৯৩৪। স্থায়ী ঠিকানা ঃ উলানিয়া, বরিশাল। বর্তমান ঠিকানা ঃ 56, Methun Road, Edgware, Middlesex, HA86EZ, UK। পেশা ঃ আওয়ামী লীগ ও ভারতের পক্ষে কলাম লেখা।

আব্দুল গাফফার চৌধুরী যার উত্থান ঘটেছিল সাহিত্যিক হিসাবে। আর সেই উত্থান পর্বের তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলিয়ে এখন প্রায় উল্টো অবস্থান নিয়েছেন। আ. গা. চৌ. এখন একজন আওয়ামী পন্থী কলাম লেখক এবং এদেশে ভারতীয় চক্রান্তের প্রচার প্রসারে সর্বাত্মক নিবেদিত একটি মিথ্যার প্রচার যন্ত্র। আ. গা. চৌ.-এর আওয়ামী বুদ্ধিজীবী পরিচয়ের চেয়েও তার আসল পরিচয় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সর্বদা সক্রিয় দালালের। তাঁর লেখায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট এবং এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা ও বিচ্ছিন্নতার উস্কানি রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষ বলে তিনি যা প্রচার করছেন তা বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য হুমকি স্বরূপ। আব্দুল গাফফার চৌধুরী স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে লেখা লিখেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান আ. গা. চৌ.কেই টার্গেট করেছিলেন। সে কারনে তাকে লন্ডনে আওয়ামী প্রচারমিশনের মুখপাত্র হিসাবে পাঠান। আ. গা. চৌ.-র সেই সময়কার ঘটনাবলী এদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। গত পাঁচ বছরের আওয়ামী শাসনে লন্ডনে বসেই আওয়ামী লীগের পক্ষে মিথ্যা সাফাই রচনা করে ঢাকার আওয়ামী পত্রিকায় পাঠিয়েছেন। এদেশের বহু সুধী ব্যক্তিকে তিনি আক্রমণ করেছেন, মিথ্যার জাল বুনেছেন। আ. গা. চৌ.-এর সেই সব লেখার জবাবে অনেকেই আ. গা. চৌর কুর্কীতি ফাঁস করে দিয়েছেন। রয়টারের সাবেক ব্যুরো চীফ প্রবীণ সাংবাদিক আতিকুল আলম, আব্দুল গাফফার চৌধুরীর শঠতা, মিথ্যাচার ও কুর্কীতির বিবরণ তুলে ধরেছেন। দৈনিক প্রথম আলো এবং সাপ্তাহিক যায় যায় দিন পত্রিকায় এসবলেখা ছাপা হয়েছিলো। প্রথম আলো আতিকুল আলমের লেখা ছেপেছিল আ. গা. চৌ.-এর লেখার প্রতিবাদ হিসাবে।

গাফফার চৌধুরী সুদূর লন্ডনে বসে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে বুদ্ধির চর্চা এবং লীগ পার্টিকে কাগজে কলমে দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন। ঢাকার কিছু পত্রিকা আ. গা. চৌ.কে টাকা দিয়ে লেখা এনে ছাপছে। আ. গা. চৌ.-এর মূল লক্ষ বাংলাদেশ থেকে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তিকে নির্মূল করা। আ. গা. চৌ.-এর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছে আওয়ামী লীগ ও এই দলের সংস্কৃতিক সংগঠক এবং আওয়ামী বুদ্ধিজীবীরা। শাহরিয়ার কবির, কবির চৌধুরী, শামসুর রাহমান, হাসান ইমাম, রামেন্দু মজুমদার, মুনতাসির মামুন, আবেদন খান গংরা। এদের সবারই একটি লক্ষ্য - বাঙ্গালী সংস্কৃতি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে বাংলাদেশের জনগণকে বিভক্ত করা,

www.pathagar.com

রাজনৈতিক সংঘাত ও অস্থিতিশীলতা তৈরী করা। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকে উপেক্ষা করা। বাংলাদেশের কূটনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সবকিছুই ভারতের নীতির সংগে সমন্বিত করা। এমনকি বাংলাদেশের সামরিক নীতি ও সেনাবাহিনীকে অকার্যকর করে এর দায়িত্ব ভারতে ইচ্ছার কাছে সমর্পন করা। আর কাজগুলো করার জন্য কৌশলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তি সেজে জনমতকে বিভ্রান্ত করা। প্রকৃতপক্ষে এরাই আজকের বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও স্বাবভৌমত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদেশের জনগণ এই দেশ বিরোধী চক্রের চক্রান্ত বুঝতে সক্ষম , সে কারণেই তাদের ব্যাপক মিথ্যা প্রচার ও প্ররোচনার পরেও এদেশের জনগণ চারদলীয় জোটকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করেছে। এদেশের জনগণের এই সচেতনতা আমাদের স্বাধীনতা ও স্বাবভৌমত্বের শক্তিকে সংহত করেছে। আমাদের দেশপ্রেমের গৌরবের ইতিহাস নির্মিত হয়েছে। অন্যদিকে চক্রান্তকারীরা হয়েছে ক্ষিপ্ত,উদভ্রান্ত। আবদুল গাফফার চৌধুরী আওয়ামী লীগের পক্ষে যে মিথ্যা ইমেজ তৈরীর চেষ্টা চালিয়ে আসছিলো তা ব্যর্থ হয়েছে। আবদুল গাফফার চৌধুরী আরো বেপরোয়া হয়ে বর্তমান চার দলীয় সরকারের বিরুদ্ধে চরম মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ইস্যু তৈরি করার জন্য আওয়ামী লীগকে সাজেশান দিচ্ছে।

এই গাফফার চৌধুরীই আওয়ামী লীগের এমপি ইকবাল যখন মালিবাগে মিছিলে গুলি করে মানুষ হত্যা করে এবং সংবাদপত্রে ছবি ছাপা হয় তখন সংবাদপত্রের সেই ছবিকে মিথ্যা বলে প্রচার করে ইকবালের মতো সন্ত্রাসীর পক্ষ নেয়।

আব্দুল গাফফার চৌধুরী সম্পর্কে, তাঁর মিথ্যাচার সম্পর্ক এদেশে অনেক লেখা হয়েছে। গাফফার চৌধুরী সম্পর্কে এখানে একটি লেখা হুবহু তুলে ধরছি।

আবদুল গাফফার চৌধুরীর কলাম এবং কিছু কথা
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন (অবঃ)

গত ৭ অক্টোবর সংবাদে প্রকাশিত আমার একটি লেখা নিয়ে প্রবাসী কলাম লেখক জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরী গত ২৪ অক্টোবর এবং ১৬ নভেম্বর প্রথম আলোতে তির্যক সমালোচনা করেছেন। তিনি তার লেখায় আমার লেখাটি থেকে বিশেষ যে কয়টি বিষয় নিয়ে প্রচুর পর্যালোচনা করেছেন তার মধ্যে প্রধান মনে হয় সীমান্ত সংঘর্ষের ব্যাপারটা। প্রসঙ্গটি পুরোপুরি না টেনে আমার মতামত ব্যক্ত করছি। আমি আমার লেখায় শুধু ভারতের কাগজের কথাই বলিনি আমি মিডিয়ার কথা বলেছি, যার মধ্যে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে ভারতের এনডিএ সরকারের অষ্টদল শিবসেনার সংসদ সদস্য সঞ্জয় নিরুপমের বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য যার মধ্যে ঢাকাতে বিডিআর সদর দপ্তরে বোমা ফেলার কথাও বলা হয়েছে। শুধু মিডিয়াতেই নয় মি. সঞ্জয় নিরুপম অত্যন্ত কঠিন ভাষায় বাংলাদেশ সরকার এবং বিডিআরের বিরুদ্ধে যে বিষোদগার উদগিরণ করেছেন সেগুলো অন্তত আমি হজম করতে পারিনি। অথচ আমাদের সরকার ছিল নিশ্চুপ। শুধু তাই নয় ভারত সরকার সমস্ত ঘটনাকে সরকারের অগোচরে বিডিআর ঘটিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন, এর জবাব দেওয়াও আমরা প্রয়োজন মনে করিনি। আমি এ বিষয়ে গাফফার চৌধুরী সাহেবের 'দি

www.pathagar.com

হিন্দু' পত্রিকার ২৪ এপ্রিলের সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এগুলো নিছক বেসরকারী মিডিয়ার বক্তব্য ছিল।

এ বিষয়েই তিনি তার প্রবন্ধের প্রায় সবটা জুড়েই আমার তির্যক সমালোচনা করেছেন। গাফফার সাহেব বিদেশে বসে রৌমারীর ঘটনা নিশ্চয়ই পুঙ্খানুপঙ্খভাবে জেনে থাকতে পারেন, তবে তিনি কিছু জায়গায় যেরকম মন্তব্য করেছেন তাতে তার ভারত-বাংলা সীমান্ত সম্বন্ধে বিশেষ করে ওই স্থানের এবং বর্তমান আঙ্গিকে এ সীমান্ত সম্বন্ধে কতখানি ধারণা রাখেন তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। রৌমারীর বড়ইবাড়ি বিওপিটি আন্তর্জাতিক সীমানা থেকে বেশ কয়েক মাইল ভেতরে। তাছাড়া ভারতের দিক থেকে সুস্পষ্টভাবে পিলার দ্বারা চিহ্নিত এবং অনেকাংশে কাটাতারের বেড়া দেওয়া। কাজেই গাফফার সাহেব যখন বলেন-সীমান্ত সংঘর্ষে সেখানে ভীত-সন্ত্রস্ত গ্রামবাসী হঠাৎ বেজায় সাহসী হয়ে ভারতের বিএসএফ-এর জওয়ানদের ভুল পথ দেখিয়ে বিভিআরের ট্রাপের নিয়ে গিয়েছিল তা কি কোনো পূর্বপরিকল্পনা এবং পেছনের কোনো প্রকার সাহায্য পরামর্শ ছাড়াই? জনাব গাফ্ফার চৌধুরীর এ বক্তব্য থেকে মনে হয় ওই অঞ্চলের গ্রামবাসীরা তার মতে যারা পালায়নি, ওই স্থানে ষড়যন্ত্র করে রেখেছিল আর ভারতের বিএসএফ কিন্ডারগার্টেনের ছাত্রদের মতো গ্রামবাসীদের পাতানো ফাঁদে পা দিতে তারকাটার বেড়া পার হয়ে ধানক্ষেতের আইলের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আর ১৬টি লাশ অস্ত্রসহ ফেলে চলে যায় অথবা সবাই মৃত্যুপথের যাত্রী হতে ফাঁদে পা দেয়। গাফ্ফার চৌধুরী সাহেব কি আমাদের চেয়ে পঞ্চাশ গুণ শক্তিশালী দেশের বিএসএফকে একটু বেশি খাটো করলেন নাকী?

১৬ নভেম্বর গাফ্ফার চৌধুরী লিখেছেন 'ভারতের অধিকাংশ পত্রিকা বাংলাদেশকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার দাবি তুলেছিল। এই দাবির সুযোগ নিয়ে নয়া দিল্লির বিজেপি সরকার যদি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার নামে ধূর্ত নেকড়ের ছাগলের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো বাংলাদেশের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত তাহলে পরিস্থিতি কী ভয়াবহ রূপ ধারণ করত তা এখন চিন্তা করতেও ভয় হয়।' এ ধরনের চিন্তাধারা তার মতো বিজ্ঞ ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে আশা করিনি। কারণ তিনি ভালো করেই জানেন, বর্তমান সভ্যতায় হঠাৎ করেই কেউ কাউকে আক্রমণ করে না তা যদি হাই মোরাল গ্রাউন্ড থেকেও হয় তবুও। আমেরিকার সন্ত্রাসবিরোধী তৎপরতা কি তার উদাহরণ নয়? যুক্তরাষ্ট্রকে হাই মোরাল গ্রাউন্ড থাকার পরেও কতখানি কূটনৈকিত প্রস্তুতি নিতে হয়েছে তালেবানবিরোধী তৎপরতার জন্য। আর রৌমারীতে বাংলাদেশের সীমানা লংঘন করে আক্রমণ করা হয়েছে সেখানে আমরা হাই মোরাল গ্রাউন্ডে ছিলাম। তাছাড়া ভারত নিজেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, এটা বিএসএফের স্থানীয় কমান্ডারের অ্যাডভেঞ্চার এতে দিল্লির সায় ছিল না। দিতীয়ত ভারত আমাদের তিনদিকের প্রতিবেশী। এতদঅঞ্চলের সর্ববৃহৎ শক্তিশালী দেশ তাই বলে আরেকটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্বাধীন দেশকে কি তার আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতে হবে। বা আক্রমণ করলে কী হবে সে ভয়ে চলতে হবে?

আমার যতদূর মনে পড়ে আমেরিকার ইউ-টু ফ্লাইটটি গোয়েন্দাবৃত্তির উদ্দেশ্যে আফগান

www.pathagar.com

আকাশসীমা লংঘন করে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবেশ করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন সেটিকে গুলি করে ভূপাতিত করে পাইলটকে জীবন্ত আটক করে। এ ঘটনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রই কূটনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘনের এবং অগোচরে অন্যের আকাশসীমা লঙ্ঘনের গর্হিত কাজের জন্য দায়ী ছিল আর সোভিয়েত রাশিয়া ছিল 'মোরাল হাই গ্রাউন্ডে'। কাজেই যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি মাফ চাওয়ার অথবা দুঃখ প্রকাশ করাটাই বাঞ্ছনীয় ছিল। আমাদের এবং ভারতের ক্ষেত্রে ভারতের রৌমারীতে অনুপ্রবেশ ভারত নানাভাবে স্বীকার করেছে। (দি হিন্দু এপ্রিল ২৬, ২০০১ দ্রষ্টব্য) যেখানে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে নিজের দেশের প্রতিরক্ষার জন্য গৃহীত ব্যবস্থার জন্য আক্রমণকারীর কাছে মাফ চাইতে হবে এ ধরনের পরামর্শ দেওয়ার মতো মেধা আমার নেই।

জনাব গাফ্ফার চৌধুরী সাহেব এক পর্যায়ে আমার ওপরে অত্যন্ত তির্যক মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, ব্রিগ্রিডিয়ার জেনারেল (অবঃ) এম সাখাওয়াত হোসেনের মতো ব্যক্তিরা খবরের কাগজে কলাম লিখে পাকিস্তানের আইএসআই এবং বাংলাদেশের চার চক্রের অসৎ প্রপাগান্ডায় রসদ জোগাতে পারতেন না। জনাব গাফ্ফার সাহেব, আমি আমার গরিব দেশের একজন নাগরিক হিসেবে অত্যন্ত গর্বিত। এ দেশ আমাকে অনেক দিয়েছে, তাই আমি আমার দেশের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের লোক নই। আমার দেশ সম্বন্ধে লিখলে যদি আপনার মতে বিদেশী চক্রের রসদ যোগান হয় তাহলে জনাব গাফ্ফার সাহেব আমি কি ধরে নেব যে, আপনি বিদেশের মাটিতে বসে এসব অন্য কোনো দেশের কর্তৃপক্ষকে খুশি করার জন্য লিখছেন?

গাফ্ফার চৌধুরী সাহেব আমার লেখার একটি অংশ তুলে ধরেছেন সেখানে কোনো প্রসঙ্গে আমি লিখেছিলাম, 'ধর্মকে কখনো জাতীয় জীবন থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়'। তিনি এর উপরে লিখেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতা জাতীয় জীবন থেকে ধর্মকে আলাদা করে না। বরং জাতীয় জীবনে প্রত্যেক ধর্মের স্বাধীনভাবে বিকাশ ও চর্চার অধিকার নিশ্চিত করে। তিনি আরো কিছুদূর গিয়ে বলেন, 'মৌলবাদীরাই চায় এক সম্প্রদায়ের ওপর অন্য সম্প্রদায়ের এবং এক ধর্মের ওপর অন্য ধর্মের আধিপত্য। সাখাওয়াত সাহেব বাংলাদেশে সেই ধরনের ব্যবস্থা চান কিনা খুলে লিখেননি।' এ কথা হয়তো ঠিক, বিষয়টি আমি খুলে লিখিনি। অবশ্য তিনি নিজেই প্রথমেই খোলাসা করেছেন। প্রথমত, গাফ্ফার সাহেব কি এ পরিবর্তিত বিশ্বে এখনো মনে করেন ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর কোনো রাষ্ট্র চলছে? আমি নিজেকে কখনোই মুসলিম জাতীয়তাবাদী বলে দাবিও করিনি এবং প্রচারও করিনি এবং এর সংজ্ঞাও আমাদের জানা নেই। গাফ্ফার সাহেব যে দেশে রয়েছেন সেখানেও কি সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষতা রয়েছে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার বিলের ওপরে লেখা 'In God we trust' কথাটি লেখার তাৎপর্যটা কী তিনি দয়া করে বলবেন?

তার ১৬ নভেম্বরের লেখার আরো পরের দিকে তিনি ভারত তোষণের কথায় এসে দুজন প্রাক্তন সামরিক নেতার দেশ শাসনের সময়ে ভারত তোষণ নীতির উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। আমি ভারত তোষণ নীতির কথা বলেছি একটি নির্বাচিত জনপ্রিয় সরকারের ব্যাপারে, কোনো সামরিক স্বৈরাশাসনের হর্তাকর্তা যাদের ক্ষমতার উৎস বন্দুকের নল

www.pathagar.com

তেমন সরকার সম্বন্ধে নয়। স্বৈরশাসকরা যে কোনো পন্থায় ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করে কিন্তু দেশের নির্বাচিত সরকারের কাছে রয়েছে জনগণের আশা-আকাঙ্খা আর অনুভূতির দাবি। আমি আমার ওই লেখাটিতেও বলেছি আজও বলছি, ভারতের সঙ্গে রয়েছে আমাদের অভিন্ন ইতিহাস তবুও আমরা দুটি আলাদা জাতিসত্তা। সঙ্গত কারণেই ভারতের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক রাখতে হবে তবে সেটা নিজের সম্মান বিসর্জন দিয়ে নয়।

রৌমারির ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ের দিকে ২৪ এপ্রিলের 'দি হিন্দু' পত্রিকায় মিঃ যশবান্ত সিংয়ের এক বক্তব্য ছাপা হয়েছে। সেখানে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ সরকার ঘটনার সমস্ত দিকগুলো তদন্ত করে দেখছে এবং এও জানিয়েছে এ সীমান্ত সংঘর্ষ সরকারের অজান্তে বিডিআর নিজেরা করেছে। এবং বাংলাদেশ সরকার স্বীকার করেছে দুঃখজনক ঘটনা। লক্ষ্য করবেন একটি দেশের সরকার তারই একটি সংগঠনের বিরুদ্ধাচরণ করছে। অথচ সে সংগঠনের কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করলেন না। করলেন ঢাকায় সীমান্ত বৈঠকের একদিন আগে। বিডিআরের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সদলবলে অসময়ে বদলি করলেন। কেন এমন ধরনের বক্তব্যই ভারত সরকারের কাছে আমাদের সরকার দিল এবং কোন চাপে পড়ে তড়িঘড়ি করে বদলি করল তা বোঝার ক্ষমতা দেশের পাঠকদের রয়েছে। এ বিষয়ে বেশী ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি না।

এর পরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী স্বউদ্যোগে দিল্লি সফর করতে চাইলে বাজপেয়ি ব্যস্ত বলে সফর সম্মতি দেওয়া হলো না।"

মুসলিম প্রধান এই বাংলাদেশে এদের আচার আচরণ থেকে মনে হয় যে তাদেরকে যেন শয়তানের প্রেতাত্মা তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যে যখন দেশের শাসনভার ইসলামী মূল্যবোধ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী শক্তির হাতে থাকে, তখন এরা নিশ্চিন্তে থাকে। পক্ষান্তরে তাদের পছন্দনীয় দল যখন রাষ্ট্রীয় শাসনতার গ্রহণ করেছিল এবং দেশ শাসন করেছিল তখনই তারা মৃত্যুকে, অর্থাৎ শয়তানের প্রেতাত্মকে বেশী ভয় পেয়েছে। যার বাস্তবতা দেখা গেছে বিগত সরকারের ৫ বছর শাসনামলে। ঐ সময়কালে আওয়ামী বুদ্ধিজীবীরা সবচেয়ে বেশী মৃত্যুর ভয় করেছে। ফলে তারা আজরাইলের হাত থেকে বাঁচার জন্যে সরকারী নিরাপত্তা নিয়েছে। আর এই নিরাপত্তার জন্যে নানা রকমের নাটকের সৃষ্টি করা হয়েছে।

শয়তানের প্রেতাত্মা 'মৌলবাদী' ভুত সেজে চাইনিজ কুড়াল, ১০ থেকে ৭২ কেজি ওজনের বোমা, রামের দা নিয়ে তাদের তাড়া করেছে। তবে এখন তাদের সেই ভয় নেই। কারণ এখন দেশ শাসন করছে ইসলামী মুল্যবোধ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী শক্তি। অবশ্য ৭৫-এর পরবর্তী ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সরকারগুলোর শাসনামলেও তাদেরকে শয়তানে তাড়া করেনি। যখনই তাদের দল ক্ষমতায় থাকে, তখনই শয়তান তাদের তাড়া করে। ইসলামী ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের বিশ্বাসের শক্তি দেশ শাসন করলে ঐসব বুদ্ধিজীবী নিরাপদে বসে তাদের আমদানিকৃত বুদ্ধি চর্চার সুবিধা পান। তখন তারা জাতির মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি, স্বাধীন বঙ্গ ভূমি প্রতিষ্ঠার রূপ রেখা প্রণয়ন, ইসলাম ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীদের বিশ্বাসীদের নির্মূলকরণের নীল নকশা তৈরীকরণ, কথিত 'মৌলবাদী'

www.pathagar.com

নিধন অভিযান পরিচালনা করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সুবিধা পান। এই সুযোগটি নিয়ে আ. গা. চৌ'র মতো জ্ঞানপাপী আওয়ামী বুদ্ধিজীবীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। তারা গোটা জাতির মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করছে চাইছে।

এদিকে আ. গা. চৌ একসময় 'বিশ্বস্ত' হিসেবে কিভাবে পাকিস্তানের সেবা করেছেন তার নমুনা পাওয়া যায় 'পাকিস্তানী খবর পত্রিকার ২৭ অক্টোবর ১৯৬৫' সংখ্যায়। ইসলাম সম্পর্কেও তিনি কত অনুরক্ত ছিলেন তাও বোঝা যায় ঐ পত্রিকা থেকে। আর আজ! এমন একটাভাব ১৯৪৭ সালেই তিনি বাংলাদেশ চেয়েছিলেন।

এ ব্যাপারে গত ১৯.০২.২০০২ তারিখের 'যায় যায় দিন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দ্বিতীয় মত' থেকে পাঠকদের জন্য নিম্নলিখিত অংশ উদ্বৃত করা হলো - এই স্মারক পত্রিকার দ্বিতীয় কভারে রয়েছে আইয়ুব খানের ছবি। এখানে ক্যাপশনে বলা হয়েছে, আমাদের সৈনিক ও রাষ্ট্রনেতা প্রেসিডেন্ট। সারা বইয়ে আইয়ুব খানের আরো অনেক ছবি ছাড়াও রয়েছে তদানীন্তন তিন বাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল নূর খান, জেনারেল মোহাম্মদ মূসা ও ভাইস অ্যাডমিরাল এ আর খান। সেখানে ক্যাপশনে বলা হয়েছে, আমাদের বিমানবাহিনী, স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর তিন প্রধান। এদের নেতৃত্বে, কুশলতায় ও বীরত্বে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর সেনানীরা ইতিহাস রচনা করেছেন। এবং সঙ্গে রয়েছে কাশ্মীর রণাঙ্গনের কয়েকটি ছবি।

এই স্মারক গ্রন্থে প্রকাশিত গাফফার চৌধুরী অনূদিত কবিতাটি ছেপে দিলাম। যাতে তার সে সময়ের ধ্যান ধারণা সম্পর্কে জানা যায়।

সালাম, পূর্ব পাকিস্তান
মূল ঃ শোরেশ কাশ্মিরী
অনুবাদ ঃ আবদুল গাফফার চৌধুরী
দেখেছি তাদের আমি কোষমুক্ত তরবারির মতো,
তাদেরে সালাম আজ
হে বাংলার আগ্নেয় যৌবন,
তোমাদের সালাম, সালাম॥
তাদের অমিত তেজ, বীর্য চির তারুণ্য আভায়
ঝলমল, যেন চিরন্তন
তাহাদের বজ্রভরা কণ্ঠে শুধু এই বজ্রভেরী
প্রতিশোধ, চাই প্রতিশোধ।
তাদেরে সালাম আজ
হে বাংলার আগ্নেয় যৌবন
তোমাদের সালাম, সালাম॥
আঘাতে আঘাতে পর্যুদস্ত শত্রুসেনা
হানাদার বৈরি ভয়ভীত
মৃত্যুবাণে, উল্লাসিত কণ্ঠে তার বজ্রভেদী ধ্বনি
আল্লাহু আকবর।
লাহোর রক্ষায় তারা পরাক্রান্ত বাহু
হয়েছে জাতির কাছে চির বরণীয়।
হে বাংলার আগ্নেয় সন্তান
তোমাদের সালাম, সালাম॥
হয়তো জানে না তারা লাহোরবাসীরা
অথবা নগরী
শ্যামল বাংলার ছেলে রক্তসিক্ত দেহে
দিয়েছে জীবন-
অকাতরে, লাহোর রক্ষায়,
দুর্দম দুর্জয় তেজে শত্রুব্যূহ মাঝে
করেছে প্রবেশ
সিনা টান করে।
বাংলার সন্তান।
অশ্রু নয়, রক্তাক্ষরে লেখা সেই শৌর্য-
শিলালিপি
তাহাদের নাম, সম্মান।
হে বাংলার আগ্নেয় যৌবন,
তোমাদের সালাম, সালাম॥
সবুজ, শ্যামল আর নয়নাভিরাম

www.pathagar.com

মৃত্তিকার ছেলে
যেখানে জমিন হাসে ছয় ঋতু ধরে
সেখানে জন্মেছে তারা
সাহসী যোয়ান,
তাহাদের কণ্ঠ আজ জয়মাল্যে ভরা,
বাংলার সন্তান-
দৃপ্ত এক মোজাহিদ, বাজু যেন, কোষমুক্ত অসি
শেরে খোদা আলী হায়দারের।
স্বভাবে বিনম্র, তেজে চির গরিয়ান।
হে বাংলার আগ্নেয় যৌবন,
তোমাদের সালাম, সালাম॥
আমরা ভেবেছি তারা, যুদ্ধে নয় অভিযাত্রী কভু,
প্রেমে আর সঙ্গীতে দিওয়ানা
মগ্ন সুর সঙ্গীত দিওয়ানা
মগ্ন সুর সঙ্গীত-সৃষ্টিতে,
কিন্তু যখন এলো রুধিরাক্ত রণাঙ্গনে ডাক
তারা এলো দলে দলে
ধ্বংস হলো ভারতীয় সেনা।
বজ্র, হে বাংলার আগ্নেয় সন্তান
তোমাদের সালাম, সালাম॥
তাহাদের কণ্ঠে নয়, সানাইয়ের তান
অসির ঝিলিক,
আঘাতে আঘাতে শত্রু উন্মাদ অস্থির
লক্ষ্য শুধু এক কাশ্মীর।
নারায়ে তকবির
ঘোষিত অমিত তেজে,
দাসত্ব-শৃঙ্খল-
তাহাদের তরে নয়
আগ্নেয় সন্তান
তোমাদের সালাম, সালাম॥
নতুন যুগের এই নতুন মিনারে
প্রতিধ্বনি শুনি-
হুনাইন আর বদরের
তারা যেন তারি প্রতিধ্বনি।
তারা যেন সেই মোজাহিদ
ইসলামের অগ্নি-জমানার।
সাহসী সন্তান
এ দেশের সাথে আজ অবিচ্ছেদ্য তার অঙ্গীকার,
কণ্ঠে সোচ্চারিত
আল্লার নবীর
মহান পয়গাম।
হে বাংলার আগ্নেয় সন্তান
তোমাদের সালাম, সালাম॥

পাকিস্তানী খবর, ২৭ অক্টোবর ১৯৬৫

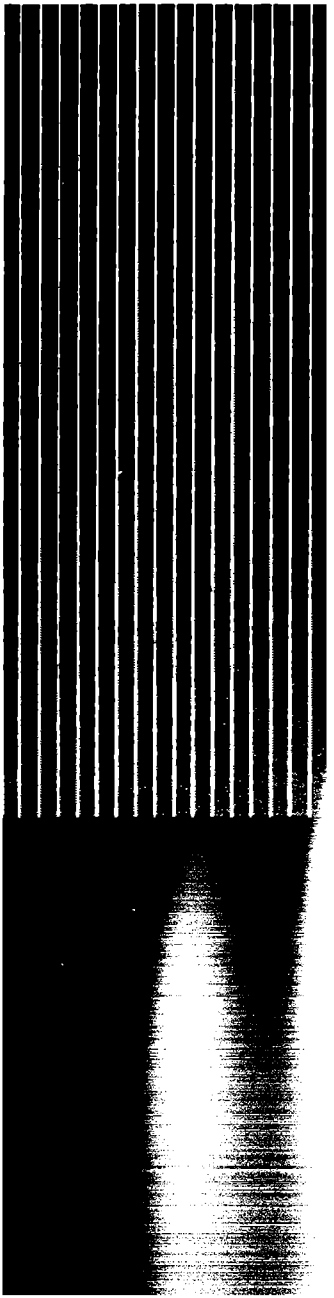

www.pathagar.com

আবেদ খান

আওয়ামী শাসনামলে কোন হরতাল কিংবা বোমাবাজী হলেই টেলিভিশনে যিনি "জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন" রাখতেন ইনিয়ে বিনিয়ে নানা ভঙ্গিতে- তিনি হলেন আমাদের সবার চেনা আবেদ খান। জাতির বিবেকের কাছে এখন আর তিনি প্রশ্ন রাখতে পারছেন না কারণ, সেই 'বাপ-বেটির বাক্স' নামক যন্ত্রটির ওপর তাঁর আর কোন আধিপত্য নেই। ছাত্রজীবনে যিনি বামপন্থী হিসেবে নিজের পরিচয় দিতেন এবং ইত্তেফাকে লেখার সুবাদে যার উত্থান ভারতীয় 'র' তাকে পেয়ে বসল ভালভাবেই। 'র' এর হয়ে তিনি বাংলাদেশে প্রচারণা করেন ভারতের পক্ষে। ভারতের বশংবদ হয়ে জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরোধিতা করাই হয়ে দাঁড়ায় তার কাজ। ত্রিখন্ডিত ভারত মাতাকে একত্রে জোড়া লাগাতে তৎপর আবেদ খান গং-এ উদ্দেশ্যে যত রকম প্রচারণা করা দরকার তা করছেন তারা।

২০০১ সালের এপ্রিল মাসে বিএসএফ এর সাথে সংঘর্ষে প্রাণ দিল ৩ বিডিআর সৈনিক। তাদের বীরত্বের সাবাশি দিল সারাদেশ। কিন্তু আবেদ খানরা লিখলেন বৃহৎ শক্তি ভারতের সাথে পাল্লা দেয়া আমাদের মানায় না। "উইপোকার কি শোভা পায় হাতির সাথে পাল্লা দেয়া?"

সুতরাং তার লেখনী থেকে যা বেরুল সবই গেল বাংলাদেশের বিপক্ষে আর ভারত মাতার স্বপক্ষে।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও অবস্থান চার দিক ঘিরে থাকা বৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের জন্য একটি ভূকৌশলগত কাঁটা স্বরূপ। বাংলাদেশের অত্যন্ত তাৎপর্যপুর্ণ ভূরাজনৈতিক অবস্থান এশিয়ার নব্য পরাশক্তি উচ্চাকাঙ্খী ভারতকে বিশেষ বেকায়দায় আটকে রেখেছে। পররাজ্যগ্রাসী বলে কুখ্যাত ভারত বিগত কয়েক দশকে তার দুর্বল প্রতিবেশী রাজ্য সিকিম, হায়দারাবাদ, গোয়া, দমন, দিউ, জুনাগড় মামভাদর এর পুরো এবং কাশ্মীরের দুই তৃতীয়াংশ শক্তি বলে গ্রাস করে নিয়েছে। হিমালয় পাদদেশের পার্বত্য যমজ কন্যা বলে খ্যাত দুর্বলতর প্রতিবেশী নেপাল ও ভুটান ভূপরিবেষ্টিত হওয়ার কারণে ভারত ঐ রাষ্ট্র দুইটির স্বাধীন অস্তিত্বকেও ধীরে ধীরে অজগরের মতো গ্রাস করে নেয়ায় সচেষ্ট রয়েছে। ভারত শ্রীলংকাকে ও তামিল টাইগারদের ইন্ধন জুগিয়ে দীর্ঘ এক গৃহযুদ্ধের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ স্বাধীনতার লড়াই চালিয়ে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নিলে ভারত কিন্তু ঐ মোক্ষম সুযোগে বাংলাদেশের মিত্র সেজে বসে। ভারতের এই মিত্র হওয়ার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় স্বাধীন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসী চক্রান্ত। আর এক্ষেত্রে ভারত পেয়ে যায় বিশ্বস্ত এবং অনুগত দালাল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এবং স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার প্রধান এবং মূল ঝুঁকি আসে ভারতের কাছ থেকেই। বাংলাদেশ এখন তিন দিক জুড়ে ভারত সীমান্ত বেষ্টিত। এবং প্রতিবেশী দেশ হিসাবে ভারতের ভূমিকা সব সময়ই আগ্রাসী এবং সন্দেহজনক। বাংলাদেশের উপর ভারত চাপিয়ে রেখেছে রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার যাবতীয়

www.pathagar.com

কার্যক্রম। বাংলাদেশকে ভারত ক্রমাগতভাবে অন্যায় চাপের মাধ্যমে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে যাচ্ছে। এদেশের জনগণ আর কিছু না হলেও ভারতের এই অশুভ মতলব ঠিকই বুঝতে পারে। আর সে কারণেই এদেশের জনগণ ভারত বিরোধী। প্রতিবেশী দেশ হিসাবে এদেশের জনগণ ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্কের ইচ্ছা রাখলেও ভারতের আচরণ এবং লক্ষ্য সন্দেহজনক হওয়ায় জনগণ সতর্কতার সঙ্গে দেখছে বিষয়টি। জনগণের যখন এমন দৃষ্টিভঙ্গি ভারত তখন বাইরে থেকেই নয় দেশের ভেতর থেকেও একটি চক্রান্তকারীদের মদদ দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত এবং বিভক্ত করার অপচেষ্টায়রত। আবেদ খান এদেরই একজন বাংলাদেশ রাষ্ট্র কাঠামো যে জনগোষ্ঠীর জীবন, চিন্তা, কর্ম ও বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল-ভারত চায় সেই মৌলিক ভিত্তিগুলো ভেঙ্গে দিতে। অন্যদিকে বাংলাদেশ একটি মুসলিম রাষ্ট্র হওয়ায় ইউরোপ, আমেরিকা, ইসরাইল, ভারতীয় অপচেষ্টা সমর্থন ও সহযোগিতা জুগিয়ে যাচ্ছে। এসব তৎপরতায় প্রত্যক্ষভাবেই ভারতীয় সমর্থন রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ, ধর্মনিরপেক্ষ ও মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক এই সব প্রচারণা চাপিয়ে দিয়ে জনগণকে বিভক্ত করছে। এসব তৎপরতায় চক্রান্তকারীরা প্রাথমিক মাধ্যম হিসাবে কিনে নিয়েছে এদেশের কতিপয়, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, লেখক, সংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সুবিধাভোগী একটি বিশেষ শ্রেণীকে।

তাই দেখা যায়, বিএসএফ সীমান্তে বিডিআর চৌকি আক্রমন করায় যখন বিডিআর পাল্টা আঘাত হানে তখন আবেদ খান 'বিদগ্ধ ভাষায়' কলাম লিখে প্রশ্ন তোলেন-বড় প্রতিবেশীর আক্রমনের জবাব দেয়ার দুঃসাহস বিডিআর কোথায় পেল? ভাবখানা তাদের এই ভারত আক্রমন করতেই পারে; কিন্তু তাই বলে সেই আক্রমণ কেন বিডিআর প্রতিহত করবে?!

আবেদ খান'রা 'জাতির বিবেকের কাছে' অনেক প্রশ্ন গত ৫ বছরে রেখেছেন। কিন্তু আমাদের জানতে ইচ্ছে করে তার নিজের কোন বিবেক রয়েছে কিনা? যদি থাকতো তাহলে তিনি কিভাবে ডাঃ ইকবালের মিছিল থেকে গুলি করার ছবি পত্রিকায় প্রকাশের পর সেই ঘটনাকে আড়াল করায় কলাম লিখতে পারলেন? কিভাবে নিজেকে 'স্বাধীনতার পক্ষে'র শক্তি বলে দাবী করে তিনি সীমান্তে হামলাকে স্বাগত জানাতে পারলেন? কিভাবে বলতে পারলেন-বিডিআর সীমান্ত রক্ষা করে ভারতের সাথে বেয়াদপি করেছে?

তাদের সকল তৎপরতার মধ্যেই একই উদ্দেশ্য এবং বক্তব্য এরা সংঘবদ্ধ। এই প্রচার কর্মকাণ্ডের জন্য এদেশের টিভি ও সংবাদপত্র সহ সকল প্রচার মাধ্যমে নিজস্ব দালাল তৈরী করে নিয়েছে। ভারতীয় অর্থে তৈরী হয়েছে সংবাদপত্র। অপপ্রচারের সুযোগ এত বেশী ব্যাপক যে এই রাষ্ট্র বিরোধী চক্রান্তকারীদের চক্রান্তের মুখোশ উন্মোচন করার মতো সংবাদ মাধ্যম তেমন নেই। যা আছে সে সব মাধ্যমকে চক্রান্তকারীরা বিতর্কিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। বলতে গেলে এদেশের দেশ প্রেমিক জনগণের সচেতনতাই এখন স্বাধীনতা স্বার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখার একমাত্র পথ।

কারা এই জাতি শত্রু? কারা এই বাংলাদেশ বিরোধী ভারতীয় অনুচরের ভূমিকা পালন করছে? যতো অপপ্রচারই হোক, যতো মিথ্যাই প্রচার হোক এদেশের জনগণ স্পষ্টভাবেই তাদের অনেকের নাম বলে দিতে পারবেন। আমাদের জাতিগতভাবে অনেক ব্যর্থতা, সফলতা থাকতে পারে, নিজেদের কর্মকাণ্ডের অনেক ভালো মন্দ সমালোচনা হতে পারে,

www.pathagar.com

কিন্তু সেই দেশদ্রোহী চক্রান্তকারীদের সঙ্গে এর কোন তুলনা চলে না। স্বাধীনতার পক্ষ বলে স্বাধীনতা বিরোধী কাজ করে। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদী ভারতের বামপ্রচার করে তাদেরকে জনগণ অবশ্যই চিনে নিতে সক্ষম।

স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের ভেতরে বিদেশী মদদে গড়ে উঠেছে দালাল গোষ্ঠী। অনেকেই অতীতের অবস্থান বদল করে যোগ দিয়েছে এই প্রচারকদের দলে। আর বাংলাদেশে এরা এখন সাংস্কৃতিক শক্তিধর গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। সীমিত সংখ্যক দালাল লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক নেতা-কর্মী দেশের গোটা প্রচার মাধ্যমে একটা ভারতীয় আধিপত্যের বীজবহন করে চলেছে। এদেশের তের কোটি লোকে সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্খার সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। আর এভাবেই এরা অবাধ বিত্ত বৈভবের মালিক হয়েছেন, এলিট সেজেছেন। এদের অনেকের আয়ের উৎস অজানা থাকলেও বিত্তের দাপট রয়েছে। এসবের উৎস কোথায় জনগণের কাছে এ প্রশ্নটিও অস্পষ্ট নয়।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসহ বিভিন্ন মাধ্যমের সঙ্গে এদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ইতিহাস এখন সবারই জানা।

কে এই শাহরিয়ার কবির, আবেদ খান? এ প্রশ্ন সম্প্রতি অনেক সাধারণ মানুষ ও তুলেছে। একই সুরে কথা বলেন এই দালাল চক্রের আরেক অন্যতম হচ্ছেন সাংবাদিক আবেদ খান। আবেদ খানও দেড় দশক আগের নিজের অবস্থান বদল করে এখন অন্য ভাষায় বলতে ও লিখতে তৎপর রয়েছেন। পত্রিকায় কলাম লিখেও কোটিপতি হওয়া যায় এটাও কারো বিশ্বাস হওয়ার কথা নয়। আবেদ খান, মুনতাসির মামুন, শাহরিয়ার কবির, আবদুল গাফফার চৌধুরী একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লিখে যাচ্ছেন বিভিন্ন পত্রিকায়। এদের সবারই বক্তব্য লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যে এক তা আগেই উল্লেখ করেছি। আবেদ খানরা চান এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চিন্তা বিশ্বাস মুছে দিতে। রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা বিপন্ন করে তুলতে, যাতে এদেশ রাষ্ট্র হিসাবে দাড়াতে না পারে। ভেতর থেকেই যেন ধ্বসের সুচনা ঘটিয়ে এদেশ সিকিমের ভাগ্যবরন করে।

মুনতাসির মামুন

পিতা ঃ মিসবাহউদ্দিন খান। জন্মস্থান ও জন্মতারিখ ঃ ঢাকা, ২৫ মে ১৯৫১। স্থায়ী ঠিকানা ঃ শুলবাহার, কচুয়া, জেলা ঃ চাঁদপুর। বর্তমান ঠিকানা ঃ ৯/ক ইস্পাহানী কলোনী, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭। পেশা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা।

মুনতাসির মামুন পেশায় অধ্যাপক হলেও নিয়োজিত আছেন সাংবাদপত্রে কলাম লেখায়। বাংলাদেশে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' ফর্মূলায় যে বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকসেবীরা কাজ করছেন, মুনতাসির মামুন তাদের অন্যতম। আবদুল গাফফার চৌধুরী, শাহরিয়ার কবির, আবেদ খান, হাসান ইমাম, রামেন্দু মজুমদারসহ একটি

www.pathagar.com

সাংবাদিক, লেখক, বুদ্ধিজীবী চক্র দেশের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে তাদের এক প্রধান ব্যক্তি মুনতাসির মামুন। এই বুদ্ধিজীবী চক্রের মুল লক্ষ্য (১) বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিরদ্ধে পরিকল্পিত প্রচারনা (২) ভারতীয় স্বার্থকে এবং ইমেজকে বড় করে তোলা (৩) এদেশের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ এবং বিপক্ষ হিসাবে বিচ্ছিন্ন বিভক্ত করা সর্বোপরি দেশের জনগণের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করা (৪) মুসলমান এবং ইসলামকে বিকৃত করে প্রচার করা (৫) ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় মুল্যবোধকে আঘাত করা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আবরণে হিন্দুত্ববাদী ভারতের সংস্কৃতিকে প্রচার করা। (৬) বাংলাদেশের ভৌগোলিক অখন্ডতা বিনাশী তৎপরতাকে সমর্থন জোগানো (৭) বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে বাঙালী সংস্কৃতির নামে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরা (৮) মুসলমানদেরকে দেশে বিদেশে মৌলবাদী হিসাবে চিহ্নিত করা (৯) পাশ্চাত্য ও ভারতীয় প্রচারণা অনুযায়ী এদেশের সংস্কৃতিকে শেকড়চ্যুত করা (১০) গোটা বিশ্বজুড়ে মুসলিম বিরোধী প্রচারণার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিদেশী এজেন্ট হিসাবে প্রচারণা চালানো (১১) ইহুদী ও পৌত্তলিকদের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক সূত্রে গোয়েন্দা সংস্থা 'র' ও 'মোসাদ'-এর পক্ষে গোপন পরিকল্পনা অনুযায়ী তৎপরতা চালানো (১২) ভারতের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়ে অখন্ড ভারত সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তিকে অযৌক্তিক প্রমাণ করা এবং ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হওয়র জন্য কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও এই উপমহাদেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো। (১৩) স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরেও মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকার প্রসঙ্গ চাঙ্গা করে সংঘাত ও অস্থিতিশীলতা তৈরী করা। বিদেশী চক্রান্ত বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগ ও সুবিধাজনকভাবে বামপন্থীদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে এ রাজনৈতিক দলগুলোকে উস্কানী দেয়া। এবং এদেশের ধর্মপ্রাণ শান্তিপ্রিয় মুসলিম জনগণকে নির্মূল করা, এক্ষেত্রে ধর্মান্ধ, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িক প্রচারণাকে কাজে লাগানো। সংখ্যালঘু নির্যাতনের মিথ্যা প্রচারনা চালানো। (১৫) রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি আওয়ামী বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী, সংস্কৃতি সংগঠন এমনকি বিদেশী অর্থ ও পরিকল্পনায় নতুন সংগঠন গড়ে তুলে প্রচারণা চালানো, এক্ষেত্রে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ও সম্মিলিত সাংস্কৃতি জোটের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। (১৬) এদেশের আলেম ওলামাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা, মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেয়ার তৎপরতা। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপিকেও মৌলবাদী ও স্বাধীনতা বিরোধী বলে মিথ্যা আখ্যা দিয়ে নির্লজ্জ প্রচারণা চালানো। (১৭) সর্বোপরি বাংলাদেশে স্বাধীনতা, স্বার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার অতন্দ্র প্রহরী বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা এবং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারসহ সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা। মুনতারিস মামুন ও তার স্বগোত্রীয় বুদ্ধিজীবীরা সবাই এইসব দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিকল্পনা নিয়েই কাজ করছেন। মুনতাসির মামুন ও অন্যান্য সকলের লেখায় উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিটি বিষয় তাদের লেখা ও বক্তব্য দিয়েই তা প্রমাণ করা সম্ভব। যে কেউ বিষয়গুলো মিলিয়ে দেখলে সহজেই বুঝতে পারবেন আসলে মুনতাসির মামুনরা কি চায়? ১৯৯৬ সালে এই মু.ত. মামুন ও তার চাচা ম. খা. আলমগীর

www.pathagar.com

গং ই দশে জনতার মঞ্চ তৈরীর নীল নকশা প্রণয়ন করে। এখনো তিনি 'চোরের মার বড় গলার' মতোই উচ্চকিত।

মুনতাসির মামুনরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পক্ষে কথা বলেন না- অথচ স্বাধীনতা পক্ষ শক্তি বলে জনগণের সামনে প্রহসন করছেন। পাদুয়া এবং রৌমারীতে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের বাংলাদেশে অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে লেখা লিখেননি। সমালোচনা করেছেন বাংলাদেশের বিডিআর ও সেনা বাহিনীর। আশ্চর্য এই দেশ যে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের এজেন্ট হিসাবে দেশের ভেতরে থেকে কিভাবে ভারতীয় আগ্রাসনের পক্ষে সাফাই লিখেছেন।

ভারতীয় অনুচর হিসাবে মুনতাসির মামুন গংরা যে দৃষ্টিভঙ্গি পোষন করে এবং তাদের লেখায় যা প্রতিফলিত হয় ১৭টি পয়েন্টে তা উল্লেখ করছি। এর প্রমান্য দৃষ্টান্ত ও তাদের লেখায় রয়েছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই-যে মুনতাসির মামুনদের সমগ্র পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী একটি বড় বাধা। যেমন বাংলাদেশের অস্তিত্ব ধারণ করে আছে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের একান্ত অপরিহার্য এই বাংলাদেশ। সেনাবাহিনী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দেশপ্রেমকে মুছে দিতে পারলেই ১৯৪৭ পুর্ব ভারতের ভূগোলে মিশে যাওয়া যায়।

সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ এই মুনতাসির মামুনদের উদ্দেশ্য করেই অভিযোগের ভাষায় বলেছেন 'বই পড়া দেশের পন্ডিত সাহিত্যিকরা অনেকেই আমাকে বলেন, বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী থাকার দরকার কি।" সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ-এর এ বক্তব্যের জবাবে মুনতাসির মামুন সেনাবাহিনীর অপ্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন 'অসামান্য হওয়ার এই চেষ্টা' শিরোনামে গত ২১ নভেম্বর ২০০১ দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক লেখায়। মুনতাসির মামুন-সাবেক প্রেসিডেন্টের অভিযোগ অস্বীকার না করে বরং সেনাবাহিনীর অপ্রয়োজনীয়তা ব্যাখা করে লিখেছেন 'সেখানে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে সেখানে সেনাবাহিনীর পিছে কতটাকা খরচ করা যায়?' (২১-১১-২০০১ দৈনিক জনকণ্ঠ) এই মুনতাসির মামুনদের সম্পর্কে দেশবাসীর সচেতন থাকা দরকার। এই আওয়ামী রাজনীতির অন্ধস্থাবকরা, দেশের শান্তি সমৃদ্ধিকে ধ্বংস করে রাষ্ট্র কাঠামো ভেঙ্গে বাংলাদেশের সীমানা মুছে দিতে চায়।

এমনকি এই মুনতারিস মামুন সাহেব ১৯৯৩ সালে ভারতীয় এক অধ্যাপকের সাথে যৌথভাবে লিখিত এক নিবন্ধে বাংলাদেশে সেনাবাহিনী থাকার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ('কেন সামরিক শাসন, কারা কখন কিভাবে আনে?'-মুনতাসির মামুন ও ডঃ জয়ন্ত কুমার রায়, মাসিক অনুসরণ, জুন ১৯৯৩)

এসব ক্ষেত্রে মু. ত. মামুন গং দারিদ্র, শিক্ষার কথা বলে বাহবা পেতে চাইলেও একবারও বলেন না যে এদেশে দুর্নীতি করে সে টাকা লোপাট করা হয় তার এক দশমাংশ কমানো গেলেও পুরো সামরিক বাহিনী পোষার খরচ উঠে আসবে। আর যদি তর্কের খাতিরে মু. ত. মামুনের যুক্তি মেনেও নিই তাহলেও বলতে হয় একজন ভারতীয় অধ্যাপকের সাথে

www.pathagar.com

কেন আপনি দেশের নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কথা বলছেন? ভারতীয়রা কি এমনিভাবে আপনাকে তাদের প্রতিরক্ষা নিয়ে কথা বলার সুযোগ দিবে?

আরেকটি বড় প্রশ্ন-আপনি যে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলেন, সেই মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে যদি ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্যাটালিয়নগুলো না থাকতো তাহলে যুদ্ধ শুরুই বা হতো কিভাবে, আর তা সংগঠিতই বা করতো কে? আপনি নিশ্চয়ই বাশের লাঠি দিয়ে পাক হানাদারদের মোকাবিলা করেননি।

আসলে ভারত যা বলতে চায় তাই মু. ত. মামুনরা বলেন। ভিন্ন কিছু নয়।

অধ্যাপক কবির চৌধুরী

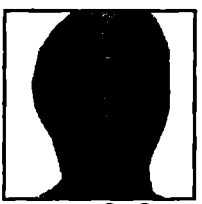

পিতা ঃ আবদুল হালিম চৌধুরী। জন্মস্থান ও জন্মতারিখ ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৯ ফেব্রুয়ারী ১৯২৩। স্থায়ী ঠিকানাঃ গোপাইরবাগ, নোয়াখালী। বর্তমান ঠিকানা ঃ ঝরোকা, সড়ক ২৮, বাড়ি ৫৬, গুলশান, ঢাকা। পেশা ঃ সভাপতি বঙ্গবন্ধু পরিষদ।

জনাব চৌধুরী সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের একজন অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে মোনায়েম খানের নিজ জেলা বৃহত্তর ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দীর্ঘদিন বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করেন। ঐ সময় জনাব চৌধুরী মোনায়েম খান, তাঁর ভাই খোরশেদ খান এবং জেলা কনভেনশন মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের নির্দেশ মোতাবেক সরকারী ছাত্র প্রতিষ্ঠান এন এস এফ-কে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। তারই সহযোগিতায় ময়মনসিংহ-এ এন এস এফ একটি দুর্দান্ত মাস্তান বাহিনীতে পরিণত হয় এবং ঐ সময় থেকেই ছাত্র রাজনীতিতে ময়মনসিংহ-এ হকিস্টিক ও রিভলবারের প্রয়োগ শুরু হয়। এন এস এফ-এর সব অপকর্মের পিছনে তিনিই ছিলেন অন্যতম প্রধান নাটের গুরু।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তিনি বিশ্বস্ততার সাথে পাকিস্তান বাহিনীর খেদমত করেন এবং স্বাধীনতার পর নিজ ভোল পাল্টিয়ে আ'লীগের কাছাকাছি চলে আসেন। জনাব চৌধুরী শিক্ষা সচিব হন এবং আ'লীগের একান্ত কাছের ব্যক্তি হিসেবে থিংক ট্যাঙ্কে পরিণত হন। অথচ তার বড় ভাই কাইয়ুম চৌধুরী পাকিস্তান আর্মির একজন কর্ণেল হিসেবে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ করেন ও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানেই থেকে যান। পরে ব্রিগেডিয়ার হয়ে অবসর নেন। এখনো সেখানে আছেন।

জনাব কবির চৌধুরী আদর্শের চেয়ে তার ব্যক্তি স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। এই কারণেই পরবর্তী সময়ে ভারত-রুশ ব্লকের আস্থা ভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হন। ভারতীয় গোয়েন্দাসংস্থা 'র' এর কাছে জনাব চৌধুরী একান্ত বিশ্বস্ত এজেন্ট হিসেবে পরিচিত। তাদের নির্দেশে তার সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তার বর্তমান মিশন হচ্ছে বাংলাদেশকে একটি তাবেদার রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত করার জন্য জাতীয় ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কোন্দল সৃষ্টি করে ভারতীয় স্বার্থ রক্ষা করা এবং

www.pathagar.com

বাংলাদেশের গুরুত্ব পূর্ণ তথ্য ভারতীয়দের হাতে তুলে দেয়া। বাংলাদেশে যাতে কোন জাতীয়তাবাদী শক্তি বিকাশ ঘটতে না পারে সে লক্ষ্যে দিল্লীর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি এবং তার অনুসারীরা সদা সক্রিয়।

স্বজাতি-স্বদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বিভীষণের ভূমিকা নিয়ে চিরস্থায়ী অপবাদ কুড়ানো যায় কিন্তু জাতির শ্রদ্ধা অর্জন করা যায় না-যেমনি উপমহাদেশের শেষ নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী মীর জাফর খা ইতিহাসে জাতীয় বেঈমান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। কিন্তু আমাদের দেশের অল্প সংখ্যক বুদ্ধিহীন নষ্ট বুদ্ধিজীবী এ চিরন্তন সত্যটি বুঝতে অক্ষম। এ সমস্ত তালিকাভুক্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রীড়নকরা তাদের ভিনদেশী প্রভুর তুষ্টির জন্য বাংলাদেশ, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদগারে লিপ্ত রয়েছেন; তালিকাভুক্ত শীর্ষস্থনীয় বুদ্ধিজীবী কবির চৌধুরী এ নারদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি গত ১৫ আগষ্ট '৯২ উপমহাদেশের খৃষ্টান যাজক উইলিয়াম কেরীর উপর আলোচনা করতে গিয়ে পবিত্র আযান, মসজিদ সম্পর্কে পাষন্ডসুলভ জঘন্য মন্তব্য করে বলেন, **''একের পর এক মসজিদ গজিয়ে উঠছে, মসজিদের সিড়িতেই চোর-বাটপার, ছিনতাইকারীসহ সকল অপকর্মের হোতাদের সাক্ষাৎ মেলে। ১৫ মিনিট ব্যাপী আযানের ধ্বনি বিররক্তিকর অবস্থায় ফেলে।''** এমন কথা তিনি প্রায়ই বলেন। বাংলাদেশে সশস্ত্রবাহিনীর প্রয়োজন নেই, এদেশে হিন্দুদের ওপর যে নির্যাতন হয়েছে তা এযাবত উপমহাদেশের কোথাও হয়নি-হাজারো কথা তিনি বলেছেন ও বলে চলেছেন।

কবির চৌধুরী ব্রাক, এডাব সহ বেশ কয়েকটি এনজিওর সাথে যুক্ত রয়েছেন। ব্রাক প্রকাশনীসহ এসব সংস্থা থেকে তার বেশ কিছু মৌলিক ও অনূদিত বই প্রকাশিত হয়েছে; এর সুবাদে তাদের কাছ থেকে বিপুল অর্থ তিনি হাতিয়ে নিয়েছেন। যার ফলে জনাব চৌধুরী বলেছেন, কেরীর তথাকথিত বাংলা ভাষা সংস্কার ছিল 'এদেশেবাসীর প্রতি তার প্রেম-ভালবাসা' অথচ বহুপূর্বেই কেরীর ভাষা সংস্কারের স্বরূপ উদঘাটন করে তার সহযোগী বৃটিশ ইংরেজ লেখক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার তার 'ইন্ডিয়ান মুসলমানস্' বইয়ে বলেছেন ঃ

"আরবী-ফাসী বর্জিত সংস্কৃতগন্ধী বাংলা ভাষার উন্নয়নে ইংরেজদের এই উৎসাহ ছিল বাঙালী মুসলমানদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু করার বহুবিধ কারসাজির মধ্যে অন্যতম।"

আর এ 'অন্যতম' কারসাজির প্রধান ভূমিকায় ছিলেন কেরী। এনজিওদের কাছ থেকে 'প্রাপ্তির যোগ' ছাড়াও কবির চৌধুরীর উইলিয়াম কেরী সম্পর্কে হঠাৎ ঔৎসুক্যের অন্য আরেকটি কারণও রয়েছে। কলকাতায় দাদাবাবুদের সহযোগিতায় উপমহাদেশে কায়েম হয়েছিল বৃটিশ রাজ। বৃটিশদের বদৌলতে বাবুরা হয়েছিলেন 'জমিদার' আর রাজ্যহারা মুসলমানরা হয়েছিলেন 'পথের-ফকির'। ঐ সময় ইংরেজ ও বাবুদের যৌথ ষড়যন্ত্রের সুফলে খুশীতে বাবু ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন-

'ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয়
মুক্ত কণ্ঠে বল সবে ব্রিটিশের জয়। অথবা

www.pathagar.com

বৃটিশের জয় জয় বল সবে ভাইরে
এসো সবে নেচে কুঁদে বিভুগান গাইবে।'

এখনো স্বাধীন ভারতে কেরীকে নিয়ে দাদা বাবুরা 'ভিবুগান' গাইছেন। আর কবির চৌধুরীরা সেই দাদাদের 'গ্রীন সিগন্যাল' পেয়েই ইতিহাস পরিষদের ব্যানারে 'ভিবুগানে' মেতে উঠেছেন। এ ব্যাপারে যে কোন সন্দেহ নাই তার প্রমাণ হলো- এ অনুষ্ঠানে কলকাতার কেরী সেন্টারের সহকারী পরিচালক রনজিত রায় চৌধুরীর উপস্থিতি ও জনাব কবীর চৌধুরী সাহেবের ভারতীয় সংস্কৃতির প্রীতি ও আনুগত্য প্রদর্শন। তিনি ঢাকায় মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন-একে 'বাঙালির প্রাচীন ঐতিহ্য' বলে চালিয়ে দেন। পক্ষান্তরে ভারতে বাবরী মসজিদ ও মুসলিম নির্যাতনে নীরব থেকে ভারতীয় সাম্প্রদায়িকতাকে সমর্থন জানান। কবির চৌধুরী জাতীয় কবিতা পরিষদ, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি সহ বিভিন্ন পরিচয়ের ছদ্মাবরণে সরাসরি মুসলমান, ইসলাম বিরোধী নানা বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন।কিন্তু বঙ্গভুমি আন্দোলন, ভারতে মুসলিম নির্যাতন, পুশ ব্যাক প্রভৃতি সার্বভৌমত্ব বিরোধী কার্যক্রম দেখেও তিনি নীরব থেকে 'নারদের' ভূমিকা পালন করছেন। এমনকি ভারতীয় দাদা বাবুদের মতই তিনি ইসলামী আদর্শ, মুল্যবোধ ও শিক্ষাকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে চরম অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করছেন। ইতিপূর্বেও অপ্রাসঙ্গিকভাবে বিভিন্ন সময় 'রাষ্ট্র ধর্ম মানে মধ্যযুগীয় বর্বরতা। মৌলবাদের এমন অসম্ভব রহস্যময় শক্তি আছে যা মানুষকে প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলে' (দৈনিক ইনকিলাব ১৩ নভেম্বর ১৯৯১) ইত্যাদি বক্তব্য তিনি দিয়েছেন। মুসলিম সংস্কৃতিকে সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি এবং পাকিস্তানী সংস্কৃতির সঙ্গে এক ও অভিন্ন মনে করে তার পুনরুজ্জীবন করা হচ্ছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। আজ কবির চৌধুরী গংদের মুসলিম জাতিসত্তা বিরোধী তৎপরতা দেখে হতাশ হতে হয়; কারণ একসময় নিজেইতো-বলেছিলেন-

"এই উপ-মহাদেশের মুসলমানদের একটি অভিন্ন ইতিহাস আছে। তারা গর্বের সঙ্গে তাদের পূর্বপুরুষের গৌরবময় কৃতিত্বের কথা স্মরণ করে। তাদের সাহসী রাজ্যজয়, শিল্প সাহিত্যে উৎকৃষ্ট অবদান, তাদের উদার শাসন ব্যবস্থা যার অধীনে বিজয়ী ও বিজিত শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে বাস করত, তাদের জনহিতকর কার্য, এইসব স্মৃতি তাদের আনন্দ দেয়। আবার মুসলিম শক্তির পতন, বিদেশীদের হাতে তাদের পরাজয় ও অপমান হওয়ার স্মৃতি তাদের বেদনাসিক্ত করে। এই ইতিহাস ভারতের অন্যান্য বাশিন্দাদের কাছ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং তাদের নিজেদের মধ্যে অধিকতর ঐক্য ও ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করে। তারা উপলব্ধি করে যে একটি পৃথক ও স্বাধীন আবাসভূমি ছাড়া তারা নির্বিবাদে তাদের ঈমান-আকিদা মোতাবেক জীবন যাপন করতে পারবে না। এই মনোভাব কিন্তু আদিতে ছিল না। পক্ষান্তরে মুসলমানগণ যখন বিজয়ীর বেশে ভারতে এসেছিল তখন তারা স্থানীয় বাশিন্দাদের সঙ্গে লেন-দেন এবং সমঝোতা সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিল। তারা তাদের ইসলামী জীবনধারা ক্ষুন্ন না করেই হিন্দুদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই সম্পর্কের ফলে ভারতীয় মুসলমানদের যে নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তার মধ্যেই তাদের পৃথক জাতীয়তার বীজ নিহিত ছিল, যে বীজ পরে মহীরুহে পরিণত হয়। বৃটিশ শাসনের ফলে তাদের সেই

www.pathagar.com

সমঝোতা ও সম্প্রীতির নীতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। হিন্দুগণ উৎসাহের সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান হারে বৈরী হয়ে পড়ে। তারা মুসলমানদের বন্ধুত্বের কথা ভুলে গিয়ে মুসলিম শাসনের পূর্ববর্তী ভারতের ইতিহাস নিয়ে প্রকাশ্যে গৌরব প্রকাশ করতে থাকে এবং যে সকল মুসলিম উপাদান ইতিমধ্যে তাদের সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল তা বর্জন করে হিন্দু পুনরুজ্জীবনের পথ গ্রহণ করে। ফলে মুসলমানগণ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারা ভারতীয় হওয়ায় ইসলামী দুনিয়ায় একটি বিশেষ পরিচিত লাভ করে আবার মুসলমান হওয়ায় ভারতেই একটি বিশেষ শ্রেণী বলে গণ্য হয়। তারা লক্ষ্য করে যে, সহিংস এবং আগ্রাসী হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের মোকাবিলায় তাদের কেবল পরিচয়ই নয় খোদ অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যাওয়ার নিশ্চিত উপক্রম হয়েছে'। (পাকিস্তানী নেশনহুডঃ বি এন আর প্রকাশিত, ১৯৬২ইং পৃ-১১৫)।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী পাকিস্তান সৃষ্টির এই ইতিহাস বর্ণনা করে লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে বলেছেন-

"তারপর কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে যে কঠোর ও বিরামহীন সংগ্রাম পরিচালিত হয় তাতে ভারতীয় মুসলমানগণ সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। তথাপি বাংলা, পানজাব, সিন্ধু ও সীমান্তের মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে (ঐ পৃঃ ৭৫)।"

নৈতিক ও ধর্মীয় উন্নতি ছাড়া কোনও জাতির উন্নতি সম্পূর্ণ হতে পারে না, এই কথা বলতে গিয়ে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ঐ নিবন্ধে বলেছেন-

"প্রেসিডেন্ট আইউব খান বলেছেন আমরা যখন জাতীয় উন্নতির কথা বলি তখন আমাদের চোখের সামনে বড় বড় শহর, বড় বড় কারখানা এবং বড় বড় এমারতের ছবি ভেসে ওঠে। কিন্তু এইগুলিই যথেষ্ট নয়। নৈতিক ও ধর্মীয় উন্নতি ছাড়া কোনও জাতির উন্নতিই সম্পূর্ণ হতে পারে না। এই উক্তিতে প্রেসিডেন্ট যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের উপর জোর দিয়েছেন তা মূলত ইসলামী আদর্শ থেকেই গৃহীত হয়েছে''।

১৯৬৭-'৬৯ সালে আনন্দ মোহন কলেজের অধ্যাপক থাকাকালীন আমাদের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে ছাত্র-সমাজ যখন প্রতিবাদ মুখর তখন এই কবির চৌধুরী সাহেব কুখ্যাত স্বৈরাচার মোনায়েম খাঁ সরকারের সমর্থনে ছাত্র-সমাজকে কি নির্মমভাবে ঠ্যাংগিয়েছিলেন-তা আমাদের জানা রয়েছে। মার্কিন অর্থপুষ্ট ঢাকাস্থ ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশন থেকে অনুবাদের নামে এবং পাকিস্তান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় B N R (Bureau of National Reconstruction)-এর প্রথম পরিচালক হয়ে কবির চৌধুরী সাহেব যে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নিয়েছিলেন-তা কি অস্বীকার করতে পারবেন। তাছাড়া B N R এর কাজ ছিলো প্রচুর সম্মানীর বিনিময়ে পাকিস্তান সরকারের ধ্যান-ধারণায় পরিপুষ্ট বই প্রকাশ করা। আর প্রথম পরিচালক হওয়ার কারণে জনাব চৌধুরী এ দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথেই পালন করেছিলেন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে জনাব চৌধুরী ও তার ভাই মুনীর চৌধুরী ভারত বিরোধী প্রচারণায় সক্রিয়ভাবে অংশ

www.pathagar.com

নেন। যুদ্ধ পরবর্তী তৎকালীন কবি সাহিত্যিকদের প্রতিক্রিয়া সম্বলিত 'সংগ্রাম সংহতি' একটি বৃহৎ সংকলন প্রকাশিত হয়-এ সংকলনে বর্তমান সময়ের অনেক নব্য বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীর নিবন্ধের পাশাপাশি কবির চৌধুরী সাহেবেরও 'যুদ্ধ ও আমাদের নবচেতনা' শীর্ষক এক দীর্ঘ নিবন্ধ রয়েছে। তাতে তিনি লিখেছিলেনঃ

''অতীত ইতিহাস দিয়ে বিচার করলে এ সিদ্ধান্ত অবধারিত হয়ে পড়ে যে হিন্দুস্থানের মতো জঘন্যতম প্রতিবেশী কল্পনা করাও দুষ্কর। আমাদের নতুন দেশ, তরুণ রাষ্ট্র। আমাদের অত্যন্ত গর্বের ও আনন্দের ধন। দুনিয়ার ইসলামী ঐতিহ্য আমাদের এতদিন বহু অনুপ্রেরণা যুগিয়ে এসেছে, ভবিষ্যতেও যোগাবে-বন্ধনের মূল সূত্রটি অত্যন্ত সহজ অথচ ইস্পাতের মতো কঠিন। তাহলো আমরা পাকিস্তানী, পাকিস্তান আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মাতৃভূমি। এই দেশের সেবায় আমরা সবর্স্ব দান করতে শুধু প্রস্তুত নই, উন্মুখ।''

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে সরকার তথা B N R এর কৃপাতুষ্ট লেখক-কবি-সাহিত্যিকগণ ভোল পাল্টিয়ে ভারতে শরণার্থী হয়ে যান-কিন্তু কবির চৌধুরী, মুনীর চৌধুরীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু শিক্ষক ও কবি-সাহিত্যিক তাদের অতীতের তীব্র ভারত বিরোধী ভূমিকা থাকায় ভারতে ভোলপাল্টানো বুদ্ধিজীবীদের কাতারে যাওয়াকে নিরাপদ মনে করেননি-তারা যুদ্ধগ্রস্ত এ বাংলাদেশেই অবস্থান নেন এবং পাকিস্তানের পক্ষে বিভিন্ন প্রচারণায় অংশ নেন। এদের মধ্যে-কবি শামসুর রাহমান, সাহিত্যিক-অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম, অধ্যাপক সাহিত্যিক হায়াৎ মামুদ প্রমুখ। যুদ্ধ চলাকালীন ঢাকা-চট্টগ্রামের ৫৫জন কবি সাহিত্যিক-শিল্পী ও অধ্যাপক পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে সমর্থন জানিয়ে এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করেন। এ বিবৃতিতে বর্তমান আলোচ্য কবির চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী সহ উল্লেখিত কবি- সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা 'ভারত ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিন্দা করে পাকিস্তানের সংহতি' কামনা করেন। প্রকৃতপক্ষে এসব বুদ্ধিজীবীরা ভারতের প্রতি মোটেও বিশ্বস্ত ছিলেন না-ফলে তারা ভারতে আশ্রয় না নিয়ে নিজেদের জীবনবাজী রেখে নিজ দেশে অবস্থান নেন এবং মুনির চৌধুরী সহ অনেকে পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে ভূমিকা নেন।

৫৫ বুদ্ধিজীবীর বিবৃতিতে কবির চৌধুরী পাকিস্তানের সংহতির কামনা থাকলেও বাংলাদেশের বিজয়লগ্নে কবির চৌধুরী সাহেব ভোল পাল্টান এবং মুক্তিযুদ্ধের মুখোশে 'বাঙালীর বুদ্ধিজীবী' সেজে বসেন। তিন প্রতারক, সুবিধাবাদী খল-নায়কের ন্যায় অত্যন্ত কৌশলে পাল্টে ফেলেন 'কেনা গোলামের চিন্তাধারা, বিশ্বাস ও লেখনী'-সবকিছু। অতীতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে ছুটে এলেন স্বাধীনোত্তর শাসকশ্রেণীর কাছাকাছি। পুর্ব পরিচয় মুছে ফেলা ও শাসক শ্রেণীর আস্থা অর্জনের জন্য কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সমর্থনে দেশে 'মাদ্রাসা শিক্ষা' বন্ধ করে দিয়ে সম্পূর্ণ সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর পরামর্শ দেন। এবং এ কমিশনের প্ররোচনায় সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের নামকে সেক্যুলার করার নামে জাহাঙ্গীর নগর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্রালয়ের মনোগ্রাম থেকে পবিত্র কোরআনের প্রথম বাণী 'ইকরা বিসমে রাব্বুকা' মুছে ফেলে, বাংলা একাডেমী ও

www.pathagar.com

মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড এর মনোগ্রাম থেকে 'আল্লামা বিল কালাম' ও 'রাব্বী জিদনী এলমা'- মুছে ফেলা হয়। ঢাকা ইসলামিয়া কলেজের নাম করা হয় বঙ্গবাসী কলেজ, জাহাঙ্গীর নগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, মুসলিম ইন্টারমেডিয়েট কলেজের নাম করা হয়- কবি নজরুল কলেজ। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, পুর্বোক্ত ক্ষেত্রে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়ার মতই কলেজের নামকরণ করার ক্ষেত্রে কবি নজরুল ইসলামের নাম থেকে ইসলাম শব্দটি এ গোষ্ঠীটি সুকৌশলে সরিয়ে ফেলে। চিটাগাং ইসলামিয়া কলেজের নামকরণ করা হয়-চিটাগাং সিটি কলেজ। কবির চৌধুরীর চক্রান্তে সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে কোরআনের আয়াত, মুসলিম শব্দ সরিয়ে ফেললেও রাজশাহীর ভোলানাথ হিন্দু একাডেমী, আনন্দময়ী নিকেতন, ভারতেশ্বরী হোমস, নটরডেম কলেজ, সেন্ট জোসেফ স্কুল, রামকৃষ্ণ মিশন, জয়কালি মন্দির ইত্যাদির উপর কোন আঁচরও পড়তে দেননি।

তিনি যে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার' পদাবলি জড়িয়ে এসব অপকর্মে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন-সে অধ্যাপনা পেয়েছেন-অনেকটা চোরাগুপ্তা পথে। কারণ কবির চৌধুরী এম এ ডিগ্রী নিয়ে শিক্ষকতার কোন সুযোগ না পেয়ে ১৯৪৪ সালে ফুড সাপ্লাইয়ে যোগ দেন এবং ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬১ সাল তিনি যথাক্রমে রাজশাহী কলেজ, ঢাকা কলেজ, ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৬১ সালে পাকিস্তান বিএনআরএ ডিরেক্টর হিসাবে যোগ দেন। ১৯৬৩-৬৬-এ নিপা ও ডিপিআই অফিসে কাজ করেন। পুনরায় ১৯৬৭-৬৯ সালে আনন্দ মোহন কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। ১৯৬৯-৭১-এ ছিলেন বাংলা একাডেমীর ডিরেক্টর। ১৯৭২ সালে মুজিব সরকারের কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সচিব ও ১৯৭৩-৭৪ এ শিক্ষা সচিব ছিলেন। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রফেসর পদে জনাব কবির চৌধুরী নিয়োগ পান, তার এ নিয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমহলকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। কারণ এ পদের জন্য অন্য আরেকজন আবেদন করেন। ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী- যার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা ও লিচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেছেন এবং ১৯৫৭ সনে ইংরেজী বিভাগের সিনিয়র লেকচারার হিসেবে যোগ দিয়ে বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি ছিলেন এ পদের যোগ্য প্রার্থী।

এমনি চোরাগুপ্তা সাজানো অভিনয়ের মাধ্যমে কবির চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে নিয়োগ পান। অথচ এ অধ্যাপনার 'অহমিকা'য় তিনি আমাদের জাতিসত্তা বিরোধী বক্তব্য রাখতে একটুও দ্বিধা করছেন না-এটা সত্যিই দুঃখজনক। কবির চৌধুরীর এ অবৈধ নিয়োগে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের নৈরাজ্য তথা দেউলিয়া অবস্থাই ফুটে উঠেছে।

www.pathagar.com

নিলীমা ইব্রাহিম

স্বামী ঃ মহম্মদ ইব্রাহিম। জন্মস্থান ও জন্মতারিখ ঃ খুলনা, ১১ জানুয়ারী ১৯২১। পেশা ঃ অধ্যাপনা (অবসরপ্রাপ্ত)।

আধিপত্য বাদী আগ্রাসী রাষ্ট্র ভারতের গোয়েন্দা তৎপরতা, মিথ্যা প্রচার কৌশল, এবং আগ্রাসী টার্গেটের দেশগুলোতে তাদের সমর্থক বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী ও অনুচর তৈরীতে যে অনেক সাফল্য অর্জন করেছে তার নজির উপমহাদেশ তথা ভারত ও তার প্রতিবেশী দেশগুলোর বিগত কয়েক বছরের রাজনৈতিক হালচাল পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়। গান্ধী-নেহেরু প্যাটেল থেকে নিয়ে ইন্দিরা, গুজরাল এবং রাজপাই সহ সকলেই মনে প্রাণে উপমহাদেশে এক বৃহত্তর অখন্ড ভারত এর স্বপ্ন দেখে এসেছেন। এ স্বপ্নের সাফল্য ও অনেক পেয়েছে ভারত। ১৯৭৫ সালে সিকিমকে পুরোটাই গ্রাস করে নিতে সক্ষম হয়েছিলো নেহেরু কন্যা ইন্দিরা গান্ধী। কিন্তু বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটানে, রাজনৈতিক প্রভাব তৈরী করলেও রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেনি। উদ্যোগ ও তৎপরতা থামেনি। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মধ্যে নেপালের রাজপরিবার হত্যার ঘটনার মাধ্যমে পরিকল্পনর ধারাবাহিকতা তুলে ধরেছেন অনেক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় পতিত আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনার ক্ষেত্রে ভারতীয় পরিকল্পনার সাফল্য বোঝা যায়। রাষ্ট্র পরিচালনায় চরম ব্যর্থতা জনগণের আস্থাহীনতা জনগনকে এতটাই জাগিয়ে দিলেছিলো যে ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জনগণের দ্বারা প্রত্যাক্ষিত হতে বাধ্য হয়। আওয়ামী লীগের পুনরায় ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার ষড়যন্ত্র জনগণই ব্যর্থ করে দেয়। আওয়ামী লীগ হেরে গেলেও তার লক্ষ্য ও পরিকল্পনার বদল হয়নি, সেটা আওয়ামী বুদ্ধিজীবী মহলের ভূমিকা ও লেখালেখিতে স্পষ্ট। আওয়ামী রাজনীতির দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে ষড়যন্ত্র এখন একটি পরিপক্ক অবস্থা নিয়েছে। এর পেছনে এখন সক্রিয় আছেন-হাসান ইমাম, রামেন্দু মজুমদার, শাহরিয়ার কবির, শামসুর রাহমান, কবির চৌধুরী, আবেদন খান এবং নীলিমা ইব্রাহিম প্রমুখরা।

ভারতমুখী আওয়ামী রাজনীতি পরিচালনায় যারা পুর্বসূচী তাদেরই একজন নীলিমা ইব্রাহিম। যিনি তার সারা জীবনের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সংস্কৃতিক কর্মধারাকে নিয়োজিত রেখেছেন সেই পথে। নীলিমা ইব্রাহিম হচ্ছেন শুধু আওয়ামী লীগেরই নয় ভারতীয় নেহেরু ডকট্রিনের একজন তাত্ত্বিক প্রভাবক ও প্ররোচক। অন্যদিকে বলা যায় নীলিমা ইব্রাহিম হচ্ছেন আজকের আওয়ামী লীগের তাত্ত্বিক উপদেশক।

নীলিমা ইব্রাহীম ষড়যন্ত্রের পথ প্রশস্থ করেছেন। আজকের আওয়ামী তরুণ বুদ্ধিজীবীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে অখন্ড ভারত সৃষ্টির সংস্কৃতিক ধারায়।

www.pathagar.com

এম আর আখতার মুকুল

পিতা ঃ সা'দত আলি আকন্দ। জন্মস্থান ও জন্মতারিখ ঃ বগুড়া, ৯ আগষ্ট ১৯৩০। স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা ঃ বি/৩ প্রোপার্টি ম্যানসন, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১০০০। পেশা ঃ সাংবাদিকতা ও লেখালেখি।

বাংলাদেশে একজন ভাগ্যবান ব্যক্তি আছেন যিনি 'বিজয়' দেখেছেন। তিনি হলেন, জবাব এম আর আখতার মুকুল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'চরমপত্র' পরিবেশনের মাধ্যমে জনাব মুকুল বিখ্যাত হয়েছেন। স্বাধীনতা আগে তিনি সাংবাদিকতা করতেন। স্বাধীনতার পরে সরকারী চাকরিতে যোগ দেন। রেডিও এবং তথ্য দফতর সংক্রান্ত পদে কিছুদিন চাকরি করার পর কুটনৈতিক দায়িত্ব নিয়ে লন্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশনে চলে যান। পঁচাত্তরে শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর দূতাবাস ত্যাগ করে লন্ডনে একটি চামড়া কারখানায় সাধারণ শ্রমিকের চাকরি করতেন বলে শোনা যায়। অতঃপর জিয়াউর রহমানের শাসনামলে দেশে প্রত্যার্বন করে সরকারী চাকরিতে পুনর্বহাল হন। অবসর গ্রহনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি তথ্য দফতরের অধীন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পে পরিচালক পদ অলংকৃত করেছিলেন। ঐ সময় তার বিজয় দর্শনের কাহিনী পুস্তকাকার প্রকাশিত হয়। নাম 'আমি বিজয় দেখেছি'।

বইটি যারা পড়েছেন তাদের অনেকেরই কাছে সম্ভবতঃ একটি প্রশ্ন উদয় হয়েছে-জনাব মুকুল যেভাবে বইটি লিখেছেন তাতে মনে হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রতিটি গুরুত্বপুর্ণ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। একজন রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে একই সময় সংঘটিত হাজার ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়া সম্ভব কিনা তা শিশুরাও জানে। এছাড়া তার বর্ণনায় ঘটনার বাস্তব উদাহরণ হিসেবে যেসব কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে তাতে নাটকীয়তা এতো বেশী যে বইটিকে ইতিহাস কিংবা তথ্যনির্ভর দলীলগ্রন্থ না বলে 'বিষাদসিন্ধু' ধরনের কাব্য বলা যেতে পারে।

জনাব এম, আর আখতার মুকুল রচিত 'আমি বিজয় দেখেছি' গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের মধ্যে এ নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়। প্রবীণ সাংবাদিক এবং জনাব মুকুলের সমসাময়িক জনাব ফয়েজ আহমদ এবং নির্মূল সেনকে বইটি সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য তরুণ সাংবাদিকরা আব্দার করলে জবাবে নির্মল সেন শুধু হেসেছেন। জনাব ফয়েজ আহমদও হেসে বলেছেন, ওর বই সম্পর্কে আমার মন্তব্য করা ঠিক হবে না।

তবে মন্তব্য শুরু করেছিলেন প্রবাসী সাংবাদিক আবদুর গাফফার চৌধুরী। সাপ্তাহিক 'যায় যায় দিন' পত্রিকায় চৌধুরী এ সম্পর্কে যে লেখা শুরু করেন। গাফফার চৌধুরী জনাব মুকুল সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন-তা এক কথায় 'ভয়ানক'।

যাহোক, 'আমি বিজয় দেখেছি' প্রসঙ্গে নয়, আমাদের আলোচনা তার 'মুজিবের রক্ত লাল' নামকে বইয়ের দ্বিতীয় সংস্কারণ প্রসঙ্গে। এটি প্রথম লন্ডন প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে।

www.pathagar.com

'ঐতিহাসিক প্রয়োজনে' তিনি এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় কোথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, এই সংস্করণে তিনি কি কি বিষয় যোগ করেছেন। তবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং গ্রন্থের সহায়তা তিনি নিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন এবং কয়েকটি সহায়ক গ্রন্থের নামও উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থ কিংবা পত্র-পত্রিকার সহায়তা নিয়ে গ্রন্থ রচনায় কোন দোষ নেই। তবে কোন গ্রন্থ থেকে কতটুকু সহায়তা নিয়েছেন তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়। পাদটীকা এবং বন্ধনী চিহ্ন ব্যবহার করে এটা করা যেতে পারে। অথবা সরাসরি এভাবে বলা যেতে পারে যে, 'অমুক গ্রন্থে অমুক লেখক এ প্রসঙ্গে লিখেছেন'।

কোথাও কোথাও এরকম উল্লেখ জনাব মুকুল করেছেন বটে। করেছেন সেই সব বইয়ের, যেগুলো এখানে প্রকাশিত এবং বহুল পঠিত হয়েছে। কিন্তু আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, কয়েকটি শিরোনামের লেখা এমন একটি বই থেকে একেবারে হুবহু তুলে দেয়া হয়েছে-যে বইটি বাংলাদেশে প্রচলিত নেই, অথবা খুব কম সংখ্যক রয়েছে।

বইটি হচ্ছে কলকাতার আনন্দ পত্রিকার সাংবাদিক সুখরঞ্জন দাসগুপ্তের 'মিডনাইট ম্যাসাকার ইন ঢাকা'। বইটি বাংলাদেশে সুলভ নয়। ইংরেজীতে লেখা এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

জনাব মুকুলের 'মুজিবর রক্ত লাল' বইটি আমাদের হাতে আসার পর চোখ বুলাতে গিয়ে আমাদের সন্দেহ জাগে। আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম সুখরঞ্জনের নিজের মুখে বলা কাহিনী জনাব মুকুল এমনভাবে হুবহু তুলে দিয়েছেন যাতে মনে হয় এটা জনাব মুকুলেরই নিজের কথা। একটি গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা একাধিক লোক দেখতে পারেন। তারা যখন সেই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দেবেন তখন তা বাক্যে বাক্যে শব্দে শব্দে মিলে যাবে এটা কেমন কথা।

জনাব মুকুল তার বইয়ে কোথাও সুখরঞ্জনের নাম উল্লেখ করেননি। সুখরঞ্জনের বই থেকে হুবহু তুলে দেয়া অংশগুলোতে তিনি বন্ধনী চিহ্নও ব্যবহার করেননি। যারা সুখরঞ্জনের বইটি পড়েননি তাদের কাছে ঐ বর্ণনা জনাব মুকুলের নিজস্ব বর্ণনা বলেই মনে হবে। এটাকে কি বলা যায়? পুকুর চুরি?

এমন হতে পারতা যে, জনাব মুকুল সুখরঞ্জনের বর্ণনা থেকে ঘটনাকে চয়ন করে নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে তিনি যদি সুখরঞ্জনের নাম নাও উল্লেখ করতেন তাতে তেমন দোষ হতো না। কিন্তু সুখরঞ্জন বইটি লিখেছেন উত্তম পুরুষে। কারণ তিনি যেসব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তা সেভাবেই বর্ণনা করেছেন। তাজউদ্দিন আহমদের সাথে তার একটি গুরুত্বপুর্ণ একান্ত বৈঠকের কথাও তিনি লিখেছেন। যেখানে কথোপকথন হয়েছে কেবলমাত্র তার এবং তাজউদ্দিনের মধ্যে। জনাব মুকুল সেই ঘটনাকে তার বইয়ে হুবহু তুলে দিয়েছেন বাংলায় এবং বর্ণনাও তার স্বাভাবিক ঢং অনুযায়ী উত্তম পুরুষে। ফলে ব্যাপারটি দাঁড়িয়েছে এমন যে, পাঠকদের মনে হবে, ঐ একান্ত বৈঠকটি জনাব মুকুল এবং তাজউদ্দিনের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। এছাড়া সুখরঞ্জনের নিজস্ব মন্তব্যগুলোও জনাব

www.pathagar.com

মুকুল হুবহু তুলে দিয়েছেন, যেন ওটাও মুকুলেরই নিজস্ব মন্তব্য। কিছু উদাহরণ দেয়া যাকঃ

জনাব মুকুল তার 'মুজিবের রক্ত লাল' বইয়ের ৯৮ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন-'

সাংবাদিকের কৌতূহল দমন করতে না পেরে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুলের বাসায় গেলাম। সৈয়দ সাহেব পুরা ব্যাপারটা না বললেও শুধু জানালেন, সাংবাদিক হিসাবে এটুকু জেনে রাখুন, আমাদের বিরুদ্ধে সরকারের মধ্য থেকেই জনা কয়েক বিরাট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। বহু চেষ্টা করেও তার কাছ থেকে আর কথা বের করতে পারলাম না। পুরা ব্যাপারটা জানার জন্য আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। এখন ডাইরীতে লিখে রাখলে, ভবিষ্যতে কাজ দিতে পারে। তাই মুজিবনগর সেক্রেটারীয়েট থেকে বিদেশ মন্ত্রণালয় আর সেখান থেকে জয় বাংলা পত্রিকা অফিস ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সব চষে ফেললাম। কিন্তু কোন কিনারাই করতে পারলাম না।

শেষে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের সঙ্গে দেখা করতে মনস্থ করলাম। স্বাভাবিকভাবেই ব্যস্ত মানুষ। তবুও দুপুরে খাবার সময় দেখার অনুমতি দিলেন। ছোট্ট একটা কামরা। তারই পিছনের কামরায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। এর মধ্যে মেস থেকে দু'জনের আন্দাজ খাবার এসেছে। খেতে খেতে অনেক আলাপ হলো। মুক্তিযুদ্ধের অবস্থা, বঙ্গবন্ধুর মামলা, সর্বশেষ খবর ইত্যাদি।

হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলাম, সেদিন ঢাকা থেকে যে নামজাদা সাংবাদিক পালিয়ে এসেছে, তাকে ইন্টারভিউ দিতে অস্বীকার করলেন কেনো?

জবাবে বললেন, 'তোমরা কিসের সাংবাদিকতা করো? ওতো পাকিস্তানী পাসপোর্টে এখানে এসেছে? দেখছোনা দিব্বি আমাদের ফরেন অফিসে জায়গা নিয়েছে'?

ফরেন অফিসের কথা উঠতেই আমি পরিষ্কারভাবে ষড়যন্ত্রের কথা জানতে চাইলাম। সেকেন্ড কয়েক চুপ করে থেকে বললেন, 'দাড়াও হাত ধুয়ে আসি, তোমাকে ফাইলটা দেখাচ্ছি'।

লোহার আলমারী থেকে অত্যন্ত গোপনীয় মার্কা মারা একটা লাল রং-এর ফাইল বের করলেন। একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, 'তুমি এখানে বসে ফাইলটা থেকে নোট করে নিতে পারো। কিন্তু ব্যাপারটা আপাততঃ গোপন রাখার চেষ্টা করবে। আমি একটু বাইরের অফিস ঘরে যাচ্ছি। জহুর আহমদ চৌধুরীর কাছ থেকে খবর নিয়ে লোক এসেছে।

একমনে ফাইলটা পড়তে শুরু করলাম। ধীরে ধীরে ষড়যন্ত্র আর রহস্যের জাল আমার কাছে উদঘাটিত হলো। মুজিবনগর সরকারের অজান্তে পররাষ্ট্র সেক্রেটারী মাহবুবুল আলম চাষী পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ও আপোষের যে প্রস্তাব পাঠিয়েছে, তার কপি পর্যন্ত ফাইলে রয়েছে।

বার দু'য়েক প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের দস্তখত করা নোট পড়লাম। তিনি এ মর্মে নোট লিখেছেন, যেসব রাজনৈতিক নেতা এই ষড়যন্ত্রে জড়িত রয়েছেন তাদের ব্যবস্থা রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগ পার্টির পক্ষে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় এবং সরকারী কর্মচারী হয়ে মাহবুবুল আলম চাষী এই জঘণ্য ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকায় আমি তাকে এই মুহূর্তে দায়িত্বভার থেকে অব্যাহতি দিলাম'।

www.pathagar.com

উপরের ঘটনার বর্ণনা জনাব মুকুলের বইয়ে এভাবেই দেয়া আছে। পাঠক, কি মনে হচ্ছে? জনাব তাজউদ্দিনের সাথে এই একান্ত বৈঠকটি এবং আলোচনা কথোপকথন যেন জনাব মুকুলের সাথেই হয়েছে, তাই না?

এবার সুখরঞ্জন দাসগুপ্তের 'মিডনাইট ম্যাসাকার ইন ঢাকায় নামক গ্রন্থের ঐ অংশ থেকে হুবহু পড়া যাকঃ

My professional curiosity was aroused. I made a bee-line for the residence of Sayed Najrul, the Acting President, All I could get was that some members of the provisional Government were involved in a vast conspiracy against it. This only wheted my curiosity. It could be a precious lead to a big story. From Mujibnagar Secretariat to the Ministry of External Affairs, from the Joi Bangla Office to Free Bangladesh Radio Station I unsuccessfully searched for infromation.

At last I decided to approach Tajuddin, the Acting Prime Minister. He was a busy man, but he granted me an interview during lunch. It was a small office with a room for him at the back.

'Do you have your meals here?' I asked him.

'Oh. I am just keeping a vow,' he said

'What sort of a vow is that?' I enquired.

'Well. we four ministers and Sayed Saheb swore at the first cabinet meeting that we shall live apart from our families till Bangladesh was free. I don't know about the others. But so far as I am concerned I can't break my vow. So it is in this very place that I work, have my food and sleep. In a way it is better, since I have more time to work, he said, and beamed at me. Shortly, food arrived from the mess. We talked fro a long time over the meal-about the freedom struggle, Mujib's trial, the latest situation at Dhaka and about many other things. 'Why have you refused to meet the renowned journalist who has come from Dhaka?' I asked suddenly.

'What sort of journalist are you?' he fired back. ' He has come on a Pakistani passport. Don't you see how easily he has found accommodation at our Foreign Office?'

The reference to the Foreign Office gave me the opening and I categorically wanted to know about the conspiracy. He brooded for a while and then said, 'Wait, let me wash may hands. I will show you the file.' He took out a red file marked ' Top Secret' from the safe and glanced through it. ' You can take notes from this file, but for the time being keep it all to yourself.' he told me.

I went through the file carefully. As I went deeper, the mystery of a

www.pathagar.com

plot gradually unravelled before me. There was a copy of the proposal in which Mr Mahboob Alam Chashi had offered negotiation and ceasefire with Pakistan. Then there was a signed note from Tajuddin, the acting Prime Minister, which read. 'It is necessary that the (Awami League) should take a political step against the leaders who are involved in this conspiracy. However, since Mabhoob Alam Chashi is a government official I hereby strip him of his post because of his involvement in this vile conspiracy,

পাঠক! এবার বলুন কে চোর! এম আর আখতার মুকুল, না সুখরঞ্জন দাসগুপ্ত?

সুখরঞ্জনের বই থেকে সরাসরি মেরে দিয়ে জনাব মুকুল পুণাঙ্গ তিনটি অধ্যায় তার বইয়ে সন্নিবেশ করেছেন। অধ্যায়গুলো হচ্ছে ঃ

১। ষড়যন্ত্রের কথা জানতে হোলে সবচেয়ে প্রথমেই আওয়ামী লীগের জন্ম কথা।

২। মুখে সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ালেও মুজিব আমলে ব্যুরোক্রেসীর মারপ্যাঁচ।

৩। ৭৪-এ তাজউদ্দীনের পদত্যাগ ঃ মুজিবের কোমর থেকে শানিত তরবারি অপসারিত।

এই তিনটি অধ্যায়ে জনাব মুকুল সুখরঞ্জনের বই থেকে একেবার হুবহু এমনকি বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দটি পর্যন্ত তুলে দিয়েছেন। এছাড়া সুখরঞ্জনের মন্তব্য, পর্যালোচনা, নিজস্ব অভিমতও জনাব মুকুল নিজস্ব মন্তব্য, পর্যালোচনা বলে চালিয়ে দিয়েছেন।

এই হচ্ছেন জনাব এম আর আখতার মুকুল। বেলাল চৌধুরী ভাষায়-'বেপরোয়া, অপ্রতিরোধ্য, দুঃসাহসী।' হ্যাঁ দুঃসাহসী এবং বেপরোয়া তো বটেই। না হলে অন্যের লেখা বই নিজের নামে চালিয়ে দেয়ার সাহস কোথায় পেলেন। ব্যবসাটি ভালোই। স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই দিনগুলোতে এবং পরবর্তী অগোছালো অবস্থার সুযোগে অনেকে অনেকভাবে বড় হয়েছেন। ফুটপাথ থেকে অনেকে রাজপ্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছেন। ভিখেরী থেকে অনেকে কোটিপতি হয়েছেন। স্বাধীনতার সুফল ঘরে তোলায় ব্যস্ত হয়েছেন এভাবে-ভাবতেই লজ্জা লাগছে। একজন সাংবাদিক হয়ে, মুক্তিযুদ্ধের একজন কণ্ঠসৈনিক হয়ে জনাব মুকুল কিভাবে এ ধরনের জঘন্য ব্যবসায় নামলেন-আমরা বুঝতে পারিনা। অর্থ কি এতোই প্রয়োজন। সুনাম, খ্যাতি কি এতোই জরুরী।

তার 'আমি বিজয় দেখেছি' গ্রন্থসহ অন্যান্য গ্রন্থ সম্পর্কেও এখন আমাদের সন্দেহ জাগছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের দায়িত্বভার পেয়েই তিনি যে তড়িঘড়ি করে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত তথ্য চুরি করে ছোট আকারে নিজের নামে বই বের করে টাকা কামিয়েছেন এই গুজবটিতে এখন আমাদের বিশ্বাস জন্মে যাচ্ছে।

[রচনাটির লেখক বদরুল ইসলাম মুনীর]

www.pathagar.com

কবি শামসুর রাহমান

পিতা ঃ মুখলেসুর রহমান চৌধুরী। জন্মস্থান ও জন্মতারিখ ঃ ৪৬ মাহুতটুলী, ঢাকা, ২৪ অক্টোবর ১৯২৯। স্থায়ী ঠিকানা ঃ পাড়াতলী, রায়পুরা, নরসিংদী। বর্তমান ঠিকানা ঃ ৩/১, শ্যামলী, সড়ক ১, ঢাকা।

একসময় যিনি ১৯৭১ সালের আগুনঝড়া দিনগুলোর 'দৈনিক পাকিস্তানে' চাকুরী করেছেন পরম নিশ্চিন্তে, সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় লিখেছেন পাকিস্তানের পক্ষে সেই তিনিই আজকের 'স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি'র প্রতিভু কবি শামসুর রহমান। তার বাবা ছিলেন একজন আলেম। অথচ তিনি ইসলাম ও মুসলমান শব্দগুলোকেই মনে করেন চরম সাম্প্রদায়িক আকণ্ঠ মদ পান ও পরকীয়া প্রেমে প্রগতিশীলতার স্বাদ আবিষ্কারেও তিনি সকলের সেরা। শামসুর রাহমান একদিকে গণতন্ত্র-গণতন্ত্র বলে চ্যাচাতে যেমন ওস্তাদ তেমনি স্বৈরাচারী এরশাদের তথাকথিত কবিতাকে শাঃ রাঃ নির্বাচিত কবিতা হিসেবে ছাপিয়ে ফায়দা লুটতেও সমান পারঙ্গম। আসলে তার কোন নীতি নেই। সুবিধা অর্জনই তার আসল নীতি। এখানে তার জঘন্য চরিত্রের কিছু ছিটেফোটা তুলে ধরা হলো ঃ

বুদ্ধিজীবীদের স্বরুপ উদঘানের প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের কার্যক্রম অনুসন্ধান করি, তাদের মূখপত্র 'পরিক্রম' বাংলা একাডেমী লাইব্রেরীতে পাই। পরিক্রমের ৪র্থ বর্ষ প্রথম খন্ড (১৩৭২-৭৩) শ্রাবণ সংখ্যার ৫৪ প্রষ্ঠায় কবি শামসুর রাহমানের 'জন্মান্ধের মতো' কবিতাটি দেখে আমরা স্তম্বিত হয়ে যাই। এ কবিতায় শা, রা, আজানকে ক্যানভাসারের অরুচিকর হাকডাকের সাথে তুলনা করেছেন।

Michngan State Uneversity-র Asain Studies Center Berbara Thomar-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত গবেষণাপত্রে ২৯২ পৃষ্ঠার ১৬ নং ফুটনোটে উপরোক্ত কবিতার লাইনগুলো উল্লেখ করে ইংরেজী অনুবাদ করা হয়েছেঃ Muazzinis call for prayer sounds like the shameless monotonous Cryings for the canvassers in the lanes and by lenes. It is as if they really spit out all the dreams beauty and sprite of the peace.

১. ইসলাম বিদ্বেষী কবিঃ শামসুর রাহমান

শা.রা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও ইসলামী আদর্শ মূল্যবোধ ও নিয়ম রীতিকে ভূলণ্ঠিত করার যে ভুমিকা নিয়েছেন তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তিনি অত্যন্ত কৌশলে কবিতার নামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইসলামের উপর আঘাত হেনে তরুণ সমাজকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে তার ন্যায় মাতাল বালখিল্যের জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করছেন। জন্মান্ধের মতো কবিতায় মূয়াজ্জিনের ধ্বনিকে অলিতে গলিতে ক্যানভাসারের আহবানের সাথে তুলনা করে বলেছেনঃ

এবং মূয়াজ্জিনের ধ্বনি যেন ক্যানভাসারের একটানা
অলজ্জিত বৈশ্যবৃত্তি অলিতেগলিতে কারা যেন বাস্তবিক
কুলকুচি করে ফেলে দেয় স্বপ্ন, স্মৃতি মেদমজ্জা সুন্দরের.....

www.pathagar.com

এছাড়া ঐ একই সংকলনে তিনি লেখেন ঃ

খ) **ঈশ্বর কি শিউরে ওঠেন মলভাণ্ডে? উনুনের**
কড়াইয়ের তীব্র জ্বালে কুকঁড়ে যান কাগজের মতো
[আত্মহত্যার আগেঃ রৌদ্র করোটিতে]

উপরোক্ত 'খ' কবিতাংশে শা. রা. উল্লেখ করেছেন তিনি নাকি আল্লাহকে মলভান্ডে দেখেছেন (নাউযুবিল্লাহ)।

২. পরকীয়া প্রেমিক কবিঃ শামসুর রাহমান

কবি শামসুর রাহমান মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি অবাধ যৌনক্রিয়া, পরকীয়া প্রেম প্রচলনের দাবী করছেন এবং বিরোধীতা করছেন ধর্মীয় অনুশাসন ও বিশ্বাসের। শা. রা. কবিতার নামে এমন কিছু পদ্য রচনা করেছেন, যা তার তীব্র যৌন লালসার ও অবাধ যৌন ক্রিয়াকলাপের সরাসরি বহিঃপ্রকাশ এবং এর মাধ্যমে দেশের তরুণদের এদিকে আকৃষ্ট করে বিপদগামী করতে চেয়েছেন। এমনকি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'পরকীয়া প্রেমে পাপ নেই।' শালীণতার স্বার্থে এখানে প্রমাণ হিসাবে অসংখ্য কবিতা থেকে কিছু উদাহরণ তুলে ধরছিঃ

শা. রা. তার কবিতার নারীকে নিছক যৌন সম্ভেকের সামগ্রী হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি সুযোগ পেলেই মেতে উঠেছেন বারবণিতার নগ্ন দেহ নিয়েঃ

ক. **হালায় আজকে নেশা করছি বহুত। রাইতের**
লগে দোস্তি আমার পুরানা কান্দুপট্টির খানকি
মাগীর চক্ষুর কাজলের টান এই মাতোয়ারা
রাইতের তামাম গতরে।

[এই মাতোয়ারা রাইত ঃ এক ফোটা কেমন অনল]

এমনিভাবে নারী প্রসঙ্গ আসলেই অযাচিতভাবে শা. রা. এর যৌনক্ষুধা জেগে উঠেছে অত্যন্ত নিলজ্জভাবেঃ

খ. অন্তরঙ্গতায় তুমি রেখে ছিলে মুখ? মনে পড়ে
গোধুলিতে কৌমার্য হরণ সেই কৈশোরের ঘরে?

[যে আমার সহচরঃ বিধ্বস্ত নীলিমা]

পাঠক চিন্তা করুন চিন্তা করুন, কেমন কুৎসিত জঘণ্য বিকৃত জীবনবোধ চিত্রিত করেছেন শা. রা. তার তথাকথিত কবিতায়। এসবের মাধ্যমে শা. রা. আমাদের সমাজকে কি শিক্ষা দিলেন।

শাঃ রাহমানদের 'আধুনিক' কবিতার নামে সৃষ্ট এসব বিকৃত পর্ণোগ্রাফি আমাদের তরুণ প্রতিভাদের কিভাবে বিপদগামী করছে, তা একজন তরুণ কবির নিম্নোক্ত ক'টা লাইন থেকে অনুধাবন করা যেতে পারেঃ

নিজেকে সমৃদ্ধ করতে হলে অভিজ্ঞতা চাই
আধুনিক জীবন যাপনে এরকম
অভিজ্ঞতার অনেক প্রয়োজন
শোনো, তুমি সময় পেলেই
নিকটবর্তী কোন একদিন একটি নীল ছবি দেখে নেবে-
সুযোগ পেলেই সমকামী হয়ে
নিজেকে জ্বালিয়ে নেবে.....

www.pathagar.com

শামসুর রাহমানের একনিষ্ঠ স্তুতিগায়ক ড. হুমায়ুন আজাদ জনাব রাহমানের এ তীব্র অশ্লীল যৌন লালসা সম্পর্কে বলেন, 'অযাচিতভাবে তার যৌন ক্ষুধা সুযোগ পেলেই জেগে উঠেছে, শামসুর রাহমান পতিতাদেহলিপ্সু। দয়িতাকে মনে পড়লেই তার মনে আসে দয়িতার শরীরের উত্তেজনা জাগানো বিভিন্ন অঙ্গ, কামময় ভুভাগ এবং যৌনবেদনমন্ডিত ক্রিয়াকলাপ-তার কামনালুব্ধ দৃষ্টিতে দয়িতা-দেহ রূপান্তরিত হয় এক পরিপুর্ণ সম্ভোগগহবরে।... যৌন ক্রিয়ার এমন বিবরণ, যা স্বীকারোক্তিমুলক ও তীব্র, বাঙলা বর্ণমালার এ-ই প্রথম লিপিবদ্ধ হলো।'

শা. রা. অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক দেশবন্ধুকে কলাম লিখতেন। এখানে অপ্রাসঙ্গিকভাবে অশ্লীলতা, বেহায়াপনাকে টেনে শা. রা. আবোল তাবোল লিখতেন। 'চাই আরো বোকা মানুষ' শীর্ষক কলামে 'নিজের বসের তোষামোদ করার জন্য নিজ স্ত্রীকে প্রয়োজনে বসের বিছানায় পাঠাতে' বলেছেন। 'এতে যদি বিবেকে বাধে তবে বুঝতে হবে আপনি আস্ত একজন বোকা। স্ত্রী যদি রাজী না হয় তাকে আর্থিক সুযোগ সুবিধা ও প্রথাগত পদ্ধতির (?) অসারতা বোঝাতে হব।' তার কবিতায় ষ্টেডিয়ামের কোন দোকানে গোপন মিলনের অঙ্গীকারের কথা আছে, টেলিফোনের জন্য অপেক্ষার কথা আছে, প্রাপ্তির অভাব ঘটলে আত্মহননের কথা আছে। শা. রা. এক সাক্ষাৎকারে নিজকে 'পরকীয়া প্রেমিক কবি' বলে পরিচয় দেন এবং পরকীয়া প্রেমে পাপ নেই বলে মত দেন' [ছায়াছন্দ জুলাই ৮৭]

৩. শামসুর রহমান বিতর্কিত কবি প্রতিভা

শামসুর রাহমানের কাব্য সম্ভার অনুসন্ধান করলে দেখা যায় তিনি কবিতায় জেনে বুঝেই এদেশের মানুষের বিশ্বাসের উপর বার বার হামলা করেছেন। তিনি চেয়ে আছেন পশ্চিমবঙ্গের কবিদের দিকে; তাদের নিকট তিনি আদরের 'শ্যামসু'। কলিকাতার আনন্দবাজার গোষ্ঠীর দেশ পত্রিকার কবি সুনীল অথবা শক্তির নিকট বিস্ময়কর হীনমন্যতা নিয়ে শা. রা. কৃপা ভিক্ষা করেন। তারা ঢাকায় এলে মদের বোতল নিয়ে হোটেলে কিংবা বাসায় উপস্থিত হয়ে নির্লজ্জভাবে নিজের কাব্য সম্পর্কে উচ্চমার্গীয় প্রশংসা প্রার্থনা করেন। এমনি ভিক্ষাবৃত্তির মানসিকতার মাধ্যমে শা. রা. দাদা কালচারের পায়রবি করতে গিয়ে দেশের সাহিত্য সংস্কৃতিকে ধ্বংসের পায়তারা করছেন। প্রকৃতপক্ষে সুনীল কিংবা শক্তি উভয়ই এদেশে আসেন তাদের নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য; যার স্বীকৃতি দিয়ে সুনীল এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর বাংলা বলতে এবং বাঙালী বলতে এখানকার মানুষকেই বুঝাবে। কেননা; দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, কলকাতায় ইংরেজী ও হিন্দির প্রতাপে বাংলার অবস্থা খুবই করুন' (দৈনিক সংবাদ, ১৭ই এপ্রিল ১৯৮৮)। উপরোক্ত স্বীকারোক্তিতে সুনীল বাবুরা তাদের নিশ্চিত হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে এ বাংলায় নিজদের প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বারবার আসছেন। অথচ শা. রা. এ সাধারণ কথাটি বুঝতে নারাজ। তিনি অত্যন্ত হীনমন্যতা নিয়ে এদের বাবু কালচারের পায়রবী করছেন আর কলকাতার 'র' -এর আর্থিক আশীর্বাদে বই প্রকাশ করতে পেরে আত্মতৃপ্তি বোধ করছেন।

শামসুর রাহমান প্রকৃত কোন কবি প্রতিভার প্রশংসা করতে নারাজ। কেননা তার সবসময় ভয় প্রশংসা করলে তিনি হারিয়ে যাবেন আর প্রশংসিত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত হবেন। মুলতঃ

www.pathagar.com

এ হীনমন্যতার কারণেই তিনি সত্যিকার কবি প্রতিভাদের ভয় পান। তাদের কোনঠাসা করার জন্য তিনি কুৎসিত কৌশল অবলম্বনেও দ্বিধান্বিত হননি। শা. রা. তার শিক্ষক জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানদের 'মধ্যযুগীয় জলদস্যু' বলে কবিতা রচনা করেন। এছাড়াও কবি আল মাহমুদকে 'গোলামের গর্ভধারিনী' বলে নিন্দা করে কবিতা (?) রচনা করে শা. রা.-এর একান্ত স্তুতিবাদক হুমায়ুন আজাদ। শা. রা. শুধুমাত্র কাব্য প্রতিভার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য দুস্যুবৃত্তির আশ্রয়ও নিয়েছেন। ১৯৮৭ সালে বাংলা একাডেমীর বই মেলায় শা. রা. এর স্তুতিবাদক পদ্য লেখক দস্যুগোষ্ঠীদের হাতে একাডেমি চত্বরে কবি আল মাহমুদ, ইমরান নুর ও ফজল শাহবুদ্দিন লাঞ্ছিত হন। এবং বই মেলার ষ্টল থেকে এদের বই নামিয়ে হাইজ্যাক করা হয়। এমনি মধ্যযুগীয় হালাকুখান ষ্টাইলের হিংস্রতার কোন নিন্দা বা প্রতিবাদ না জানিয়ে শা. রা. এসব গুণ্ডাদের পোষ্যতার ভূমিকা নিলেন। শা. রা. এ সমস্ত অকবি পদ্য লেখকদের পুষে তার প্রতিপক্ষদের পরাভুত করতে চান।

৪. চৌর্যবৃত্তির কাঠগড়ায় ঃ কবি শামসুর রাহমান

বাংলাদেশের জনপ্রিয় খ্যাতিমান কবিদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কবি শা. রা.। যে কবিতাগুলো শা. রা. কে এ খ্যাতি দিয়েছে তার প্রায় সবকয়টি জনপ্রিয় বিখ্যাত কবিদের কবিতার আক্ষরিক অনুবাদ অথবা অনুসরণ। 'দুঃখিনি বর্ণমালা' নামক একটি কবিতা শা. রা. কে অসম্ভব জনপ্রিয় করেছে। অথচ এ কবিতাটি আমেরিকার কবি ডেনিস লেভার্টভের Reburning the Alphabat কবিতার অনুবাদ। এ কবিতাটি শিকাগো থেকে প্রকাশিত 'কবিতা' পত্রিকায় প্রথম মুদ্রিত হয়। শিকাগোর এ কবিতা পত্রিকা শা. রা. এর অনেক কবিতার উৎসভূমি। শা. রা. এশ অন্য আরেকটি কবিতা 'স্বাধীনতা তুমি' এটি বিশেষভাবে তাকে খ্যাতি দিয়েছে। এই কবিতাটি শব্দের পুনরাবৃত্তির কৌশলের মাধ্যমে পাঠকের চিত্তকে চরমভাবে আচ্ছন্ন করে। এ কবিতাটি বিখ্যাত ফরাসী কবি পল এলুয়ারের liberty কবিতার আক্ষরিক অনুবাদ। এছাড়াও শামসুর রাহমানের 'আত্মহত্যার আগে' কবিতার সাথে জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন 'কবিতার এবং তার খেলনার দোকানের ভিখারী' কবিতার সাথে জীবননান্দের 'লঘু মুহূর্ত' কবিতার হুবহু মিল রয়েছে। তার 'একজন লোক' কবিতার সঙ্গে বুদ্ধদেবের 'লোকটা' কবিতার মিল আছে। বুদ্ধুদেবের 'রবীন্দ্রনাথ' সনেটটির ছায়া পড়েছে শামসুর রাহমানের 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতা।

এমনি ন্যাক্কারজনক কুৎসিত চৌর্যবৃত্তি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে করল কলঙ্কিত। পল এলুয়ার মত বিখ্যাত কবিসহ বিভিন্ন জনপ্রিয় কবিদের কবিতা অনুবাদ করে নিজের বলে চালিয়ে দেয়ার মত ন্যাক্কারজনক কাজ মোটেও তার করা উচিত হয়নি।

৫. স্বৈরাচার সেবকঃ কবি শামসুর রাহমান

শা.রা. আজীবন সরকারের একনিষ্ঠ স্তাবকের ভূমিকা পালন করলেও '৮৭ সালের শেষভাগে দৈনিক বাংলা ও বিচিত্রার সম্পাদনা থেকে পদত্যাগ করে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন। অথচ '৮৯ এ এসে শা.রা. জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বৈরাচার এরশাদের রাজদরবারে ধর্ণা দিয়েছেন। '৮৭ সালের পদত্যাগ পত্রে তিনি

www.pathagar.com

বলেছিলেন- 'গণতন্ত্রের নামে সরকার যথেষ্ট অগণতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন, তারা সংবাদপত্রের মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছেন। কারারুদ্ধ করেছেন সাংবাদিকদের। ব্যাপক ধরপাকড়া এবং জেল জুলুমের মাধ্যমে তাদের তথাকথিত গণতান্ত্রিক চেতনার যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে যে কোনো শুভবাদী, গণতন্ত্রকামী পীড়িত হতে বাধ্য। সর্বপরি তারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছে; জনগণের সকল মৌলিক অধিকারহরণ করেছে। এ অবস্থারও অবসান হয়নি স্বৈরাচারও উৎখাত হয়নি"। শা.রা. বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা নিয়ে তার সেই 'স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কবিতা' শ্লোগানকে 'প্রতারনার জন্য কবিতায়' পর্যবসিত করলেন। কারণ তিনি পদত্যাগ যে কারণে করেছিলেন আবার তার সাথেই আপোষ করে জনগণকে প্রতারিত করলেন। শা.রা. এর এই বিশ্বাসঘাতকের চরিত্র মজ্জাগত। জাতির প্রতিটি দুর্যোগ মুহূর্তে তিনি স্বৈরাচারের সমর্থক ছিলেন। ১৯৬৪ থেকে '৮৭ পর্যন্ত শা.রা. সরকার নিয়ন্ত্রিত দৈনিক পাকিস্তান পরবর্তীতে দৈনিক বাংলায় কর্মরত ছিলেন। এ দীর্ঘ সময়ে রাজনৈতিক অঙ্গণে অনেক উত্থান পতন ঘটেছে। এ সময় সংঘটিত হয়েছে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, '৭৪-এ কুখ্যাত গণবিরোধী চতুর্থ সংশোধনী, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ঘটনায় শা.রা. কোনরূপ সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রাখেননি। শা.রা. সাংবাদিক হিসেবে নিতে পারতেন অগ্নি সৈনিকের ভূমিকা, শাণিত করতে পারতেন তিনি জনগণের আন্দোলনকে। কিন্তু রহস্যজনকভাবে শা.রা. জনগণের দাবীকে পদদলিত করে প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচারের পায়রবী করেছেন। অথচ এ সময় স্বৈরাচার বিরোধী নিরাপোষ ভূমিকার জন্য ফররুখ আহমদের মত একজন বিবেকবান প্রধান কবিকে চাকুরীচ্যুত করা হয়। একইভাবে কবি আল মাহমুদকে কারাগারে চরমভাবে নিপীড়িত হতে হয়।

শা.রা. প্রভুভক্তির মহাগুণে গুণান্বিত, বিশেষত; একচোখা দৈত্য স্বৈরাচারের। জনগণের সাথে অভিনয়ে তিনি ওস্তাদের ওস্তাদ। ১৯৭১ সালে এদেশের প্রতিটি মানুষ যখন স্বৈরাচার বিরুদ্ধে স্বাধিকার আদায়ের জন্য মরনপণ যুদ্ধে লিপ্ত; তখন শা.রা. কুখ্যাত সামরিক জান্তা টিক্কাখানের সহযোগিতায় তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় রাজাকার- আলবদরদের মহান দেশপ্রেমিক আর মুক্তিযোদ্ধাদের 'সন্ত্রাসবাদী ভারতীয় দালাল' বলে প্রচারণা চালান। একইভাবে '৭৪ সালে মুজিব সরকার যখন সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে কুখ্যাত স্বৈরাচারী চতুর্থ সংশোধনী বিল পাশ করেন এবং সরকার অনুগত চারটি পত্রিকা ছাড়া সকল পত্রিকা নিষিদ্ধ করেন তখন শা.রা. এর প্রতিবাদ না করে অভিনন্দিত করেন এবং এখনও এসব নীতি সঠিক মনে করেন। '৭৫ এর আগস্ট পট পরিবর্তনের পর তৎকালীন সরকারের দালালীর মাধ্যমে নিজকে সম্পাদক পদে উন্নীত করেন জনগণ স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে হরতাল, ধর্মঘট এর মাধ্যমে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে; এ আন্দোলনের বলি হতে হয়েছে বহু গণতান্ত্রিক শক্তিকে। কিন্তু শা.রা. '৮২ সাল থেকে পাঁচটি বছর সাপ্তাহিক বিচিত্রায় 'শামসুর রাহমানের মনোনীত কবিতা' শিরোনামে সামরিক জান্তা এরশাদের কবিতা প্রকাশ করে এরশাদকে 'কবি' হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। স্বৈরাচার এরশাদের সফরসঙ্গী হিসাবে ভারত, চীনসহ কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন। এখন প্রশ্ন হলো এমনি 'সোনায় সোহাগার' বিচ্ছেদ ঘটেছিল কেন? এর পিছনে রয়েছে ভিন্ন রহস্য। শা.রা. পদত্যাগের ছয়মাস পূর্বে দৈনিক

www.pathagar.com

বাংলা ও সাপ্তাহিক বিচিত্রার প্রিন্টার্স লাইন থেকে সরকার তার নাম বাদ দেন। এমনি চরম লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে তিনি পদত্যাগ না করে স্বৈরাচারের সাথে আপোষের ফর্মুলা খুঁজতে থাকেন। কিন্তু এ প্রচেষ্টার বাধা দিলেন তার বিদেশী প্রভুর এজেন্ট, কলিকাতার সাম্প্রদায়িক আনন্দবাজার গোষ্ঠীর সাপ্তাহিক দেশ এর কবি শক্তি চট্টপাধ্যায়; তিনি শা.রা. কে ভৎর্সনা করে পদত্যাগ করতে বলেন, (সাপ্তাহিক রোববারঃ ২৯ নবেম্বর '৮৭)। এর মাত্র এক সপ্তাহ পর তিনি পদত্যাগ করেন।

৬. সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর দালালঃ কবি শা.রা.

শামসুর রাহমান বাংলাদেশের মাটিতে লালিত পালিত হলেও এদেশের প্রতি, জনগণের প্রতি তার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই; যার ফলে তার কাব্যের কোথাও এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসের প্রতিফলন নেই। বরং কাব্যের ছন্দাবরণে এদেশের জনগণের বিশ্বাসে আঘাত করেছেন বিভিন্ন কৌশলে একইভাবে এদেশের স্বাধীনতা ও সর্বভৌমত্বের ব্যাপারেও তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার। ভারতীয় উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী বঙ্গভূমি আন্দোলনের নামে আমাদের দেশকে খন্ড-বিখন্ড করার ষড়যন্ত্র করছে; এ সম্পর্কে দেশের সর্বস্তরের জনগণ নিন্দা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আহবান জানিয়েছেন; কিন্তু রহস্যজনকভাবে শা.রা. নিরবতা পালন করেন। অথচ শা.রা. কলিকাতার সাংবাদিক শৌলক লালিড়ীর সাথে এক সাক্ষাৎকারে ভারত বিভক্ত হওয়ার আশংকায় উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে বলেছেন, "আমি বড়ই আশংকিত; আসাম, পাঞ্জাব, সাম্প্রতিক গোর্খাল্যান্ড ও অন্ধ্র, ভারত হয়ত ভবিষ্যতে বিভক্ত হয়ে যাবে বহুখন্ডে। আমি বড় আশংকিত এদেশ কি ভাষাগত ব্যবধান গড়ে তুলবে যত্রতত্র? হবে খান খান?" দৈনিক আজকাল; কলকাতা ২৪ অক্টোবর '৮৬]।

বাংলাদেশ সম্পর্কে শা. রাহমানের দায়িত্ব জ্ঞানহীন মন্তব্য দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই; যখন শা. রা. সাক্ষাৎকারে বলেন- *'আমার শহর তালিমারা জামা পড়ে নগ্ন হাটে, খোড়ায় ভীষণ। সেখানে যে গণতন্ত্রহীনতা, ধর্মব্যবসা, কুসংস্কার, তার বিশ্রী ঘন ঘন ছায়া আমার স্বাধীনতার গর্ব খাটো করে দেয় অহর্নিশি। কারণ এ শহরে দিনরাত্র পীরের দরবারে ধর্ণা দেয়, রাত্রদিন করে রক্তবমি। কলকাতা আমার নিকট নিউইয়র্কের মত। প্রথম আলাপে জড়তা থাকে। জনজাল দেখলে মন হয় খারাপ। কিন্তু তেরাত্রি কাটলেই কলকাতা, আমার প্রেমিকা হয়ে যায়। আমি যথার্থ পাই এর সাংস্কৃতিক স্পন্দন'।* [দৈনিক আজকাল কলকাতা, ২৪ অক্টোবর, ৮৬] এমনি নির্লজ্জভাবে বিদেশের কোন শহরের প্রসংশা করার জন্য যিনি বিদশের মাটিতে বসে নিজ দেশের রাজধানী শহরের বদনাম করা অপরিহার্য মনে করেন তার এ গোলামীর মানসিকতা কিভাবে বিশ্লেষণ করা যায়?

বাংলাদেশের কবি, সাহিত্যিকদের মধ্যে রুশ ভারতীয় দালাল গোষ্ঠী সৃষ্টির জন্য ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' ও তৎকালীন বাংলাদেশেস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার মুকচেন্দ দেবে এবং পশ্চিম বঙ্গের কবিদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় 'পদাবলী' নামে একটি কবিগোষ্ঠী সৃষ্টি করা হয়। এ কবি গোষ্ঠী কোন সাহিত্য চর্চা নয় বরং ভারতের স্বার্থ রক্ষায় নিবেদিত, তা এ গোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপ থেকেই অনুধাবন করা যায়। পদাবলীর অনুষ্ঠানে প্রথম থেকেই শুধুমাত্র ভারতীয় আধিপত্যবাদ বিরোধী মনোভাবের কারণে সৈয়দ আলী আহসান, আল

www.pathagar.com

মাহমুদ, মেহাম্মদ মনিরুজ্জামান, হাসান হাফিজুর রহমান, ফজল শাহাবুদ্দিন, আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রমুখ কখনই নিমন্ত্রিত কিংবা অনুরুদ্ধ হননি। আর যারা 'র' এর আশীর্বাদ পুষ্ট পদাবলী গোষ্ঠীতে যোগ দিলেন তাদের মধ্যে শামসুর রাহমান, এ জেড এম ওবায়দুল্লাহ, সৈয়দ শামসুল হক, মহাদেব সাহা, নির্মলেন্দু গুণ, সাইয়্যিদ আতিকুল্লা, আবুল হোসেন প্রমুখ অন্যতম।

১৯৮২ সালে শামসুর রাহমান পদাবলীর পক্ষ থেকে ইন্দিরা গান্ধির সাথে শুভেচ্ছা সাক্ষাৎ করেন। পদাবলীর কার্যক্রম জেনে মিসেস গান্ধী শা. রা. কে অভিনন্দিত করেন। শা. রা. স্বৈরাচার এরশাদের সফরসঙ্গী হিসাবে দিল্লী যান, সেখানে মুকচেন্দ দেবে আয়োজিত কবিতা পাঠের আসরে শা. রা. দীর্ঘক্ষণ কবিতা পাঠ করেন। এছাড়াও মুকচেন্দ দেবে শামসুর রাহমানের অনেকগুলো কবিতার হিন্দি অনুবাদ আবৃত্তি করেন।

৭. দুর্নীতিবাজ কবিঃ শাসসুর রাহমান

শামসুর রাহমানের কবিতার দুর্নীতির মুখোশ ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। শা. রা. দীর্ঘদিন সরকার পরিচালিত দৈনিক বাংলা ও সাপ্তাহিক বিচিত্রার সম্পাদক ছিলেন।

পাকিস্তান আমলে শা. রা. তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেন। '৭১ সালে শা. রা হানদার নরপিশাচ টিক্কা খানের পক্ষে দৈনিক বাংলা (তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তান) থেকে প্রচারণা চালিয়ে তার বহুকাঙ্খিত সম্পাদক পদটি পাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আশার গুড়ে বালি দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। এরপরও তিনি পিছিয়ে রইলেন না, খুব তাড়াতাড়ি কবিতার নামে শ্লোগান সর্বস্ব 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্য গ্রন্থ রচনা করে নিজকে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। শা. রা. সৃষ্ট ষড়যন্ত্রমূলক বিশৃংখলার শিকার হয়ে হাসান হাফিজুর রহমানের মত একজন বিবেকবান নিরপরাধ ব্যক্তিকে সম্পাদক পদ থেকে সরে যেতে হয়। এরপর সম্পাদক হিসাবে আসেন নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী; পূর্বের ন্যায় শা. রা. কর্মচারীদর লোভ-লালসা দেখিয়ে সম্পাদকের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন। যার ফলে ১৯৭৭ সালে জনাব পাটোয়ারীকেও হাসান হাফিজুর রহমানের ভাগ্যবরণ করতে হয়। এসময় শা. রা. তৎকালীন সরকারের সাথে আঁতাত করে সম্পাদকের পদটি দখল করে নেন। ১৯৮৫ সালে সরকার যে সমস্ত কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিকের ঢাকায় নিজস্ব বাড়ী নেই, শুধুমাত্র তাদের জন্য গুলশান বানানীতে কিছু প্লট বরাদ্দ করেন; এসময় শা. রা. ঢাকায় নিজস্ব বাড়ী থাকা সত্ত্বেও মিথ্যার আশ্রয়ে গুলশানে প্লট গ্রহণ করেন।

[লেখক - বদরুল ইসলাম মুনীর]

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

জন্মস্থান ও জন্মতারিখ ঃ বগুড়া, ১ মে ১৯২৭। স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা ঃ আকাশ প্রদীপ, ৫২/৩ ইন্দিরা রোড, ঢাকা।

আজ তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা। অথচ এই তিনিই১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান সরকারের

www.pathagar.com

স্কলারশিপ নিয়ে লন্ডনে গিয়েছিলেন উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য। সাথে ছিল পাকিস্তানী পাসপোর্ট। মুক্তিযুদ্ধ শেষে তিনি পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স যোগে পাকিস্তান হয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। পুরো ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তার কোন ভূমিকা ছিল না।

পাকিস্তান আমলে শ্রেণী সংগ্রাম মুস্তফা-নুরউল ইসলামের সভাপতিত্বে ঢাকা বার লাইবেরী হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় বলেছিলেন-

'রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া ও পুজিপতি-তিনি বিত্তের অহংকারে ও নির্মমতায় সাধারণ' মানুষকে অবহেলা করে কাব্যে, গানে, সুরে ও ছন্দে মোহবিষ্ট করে তার শোষিত প্রজাসাধারণকে তন্দ্রাচ্ছন্ন কর রাখতেন। এবং সেই সুযোগে অবাধ শোষণ চালিয়ে যেতেন (যে যার বৃত্তে দৈনিক বাংলা ২২ জানুয়ারী '৮৮)।

কিন্তু বর্তমানে সেই মুস্তফা নুরুউল ইসলাম বলছেন-

'আটচল্লিশ, উনপঞ্চাশে, পঞ্চাশে, বায়ান্নের আগের বছর একান্নোতে আমরা তখনকার ছাত্র তরুণরা প্রতি বছর পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করে গেছি, ঢাকায়, চট্টগ্রামে, রাজশাহীতে, খুলনা আরো নানান শহরে ক্ষমতাধারী কর্তৃপক্ষের নিষেধ ছিল, অশুভ শক্তির দিক থেকে হামলার আশংকা ছিল, কোথাও কোথাও হামলা হয়েছেও। সঙ্গতভাবেই জিজ্ঞাসা, কেন অমনতর বারণ, যার প্রশাসনের পশ্চাতে উর্দিধারীর দন্ডাস্ত্র অথবা গুণ্ডার লাঠি। চার দশকেরও বেশী কেটে গেছে, কি করে বিস্মৃত হব, অমন ভয়াবহ দুঃসময় গেছে আমাদের রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে (দৈনিক সংবাদ, ২৫ বৈশাখ ১৩৯১)।'

এভাবেই মুস্তফা স্বাধীনতার পর ভোলপাল্টিয়ে মুজিবপন্থী সেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা থেকে শিল্পকলা একাডেমী ও পরে বাংলা একাডেমীর মহা পরিচালক হন। আর জিয়ার আমলে চেষ্টা করেও সুবিধা করতে না পারলেও এরশাদ আমলে শিল্পকলা একাডেমীর এক সংকলন সম্পাদনার নামে আশি হাজার টাকা লুটে নেন। একইভাবে নজরুল ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর এররশাদ গংগদের সহযোগী হিসেবে ট্রাষ্টি বোর্ডের মেম্বার পদ দখল করে। নজরুল বিষয়ে গবেষণার নামে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নেন। এভাবেই শ্রেণী সংগ্রামী মুস্তফা সাহেব সরকারী সম্পদ লুন্ঠনে মেতে আছেন।

বিচারপতি (অবঃ) কে এম সোবহান

তিনি মুলতঃ পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। তিনি উকিল থেকে বিচারপতি হন। এদেশে আসার পর পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে মুসলিম নির্যাতন সম্পর্ক বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করেন। একজন দুর্নীতিপরায়ন ব্যক্তি হিসেবে তিনি পরিচিত লাভ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে ১৯৭১ সালে টিক্কা খানের কাছে শপথ নিয়ে তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের হইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। তিনিই এখন মুক্তিযুদ্ধের প্রবক্তা হয়েছেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদের আমলে দুর্নীতির অপরাধে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি পদ হারান। তিনি একজন কট্টর আওয়ামী পন্থী। তার চিন্তায় মননে এবং লেখনিতে তিনি বিএনপির বিরুদ্ধে বিষোধগার করেন। তিনি প্রথম দিকে হিন্দু-বিদ্বেষী হলেও আওয়ামী লীগের সাথে গাঁটছড়া বাঁধার পর একজন হিন্দু প্রেমীক

www.pathagar.com

সাজেন। তিনি 'র'-এর একজন কট্টর এজেন্ট। আরো জানা যায় ১৯৭১ সালে
মুক্তিযুদ্ধের সময় নিশ্চিন্তে ঢাকায় থেকে পাক সরকারের হাইকোর্টের বিচারপতি হি
দায়িত্ব পালন করেন। সে সময় তাকে কোনক্ষেত্রেই মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় এ
আসতে দেখা যায়নি।

আজ তিনি সংখ্যালঘুদের জন্য মায়াকাঁন্না কাঁদছেন। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে ১৯৪৭ সা
এদেশে এসে ঢাকার মালিবাগে হিন্দুদের জায়গা দখল করেছিলেন।

তাদের অর্থানুকূল্যেই বর্তমানে তাঁর সংসার চলে। তিনি অর্পিত সম্পত্তি আইনের একত
কট্টর সমালোচক এবং এ আইন রদ করার জন্য বিভিন্ন সভা-সমিতিতে কড়া বক্তব্য
রাখেন। ভারতীয়দের দিক-নির্দেশনায় পরিচালিত তার সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ড।

তার কথাবার্তা শুনে, লেখা পড়ে মনে হয়, তার মতো পাকিস্তান বিরোধী এই দুনিয়াতে
আর কেউ নেই। তার স্বার্থই যেন ভারতীয় স্বার্থ। এ দুটো সমার্থক। তাই দেখা যা
বাংলাদেশে তথাকথিত সংখ্যালঘু নির্যাতন তিনি খুঁজে পান, কিন্তু ভারতের গুজরাটে প্রায়
দেড়হাজার মুসলমান নিহত হলেও তার মুখ দিয়ে টু শব্দটি বের হয় না। তিনি কথিত
মানবাধিকার কনভেনশন-এর আয়োজন করতে পারেন। কিন্তু যখন বাংলাদেশের
স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয় তখন তিনি থাকেন নিশ্চুপ।

ব্যারিস্টার আমির-উল ইসলাম

ব্যারিষ্টার আমীর-উল-ইসলাম কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার সাথে তাকে জড়ানো হতে পারে এই আশংকায় এক সময় আমীর-উল ইসলাম আওয়ামী লীগের রাজনীতি থেকে ছিটকে পড়েন। পরে তিনি 'র' এর সম্পর্শে আসেন এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। মুলতঃ 'র' এর পরামর্শেই শেখ হাসিনা তাঁকে আওয়ামী লীগে স্থান দিতে বাধ্য হন। এভাবে ব্যারিষ্টার আমীর-উল-ইসলাম আবার লাইম লাইটে চলে আসেন। আওওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের তিনি মধ্যমনি। ভারত তথা 'র' এর স্বার্থ যেভাবে হাসিল হয় সেভাবেই তিনি কাজ করেন। লাভ করেন বিত্ত-বৈভব।

তার বাগাড়ম্বরের তিনি খুবই পটু। এটাকে কাজে লাগিয়ে তিনি আদালতে কথার ফুলঝুড়ি রচনা করেন। এভাবে আওয়ামী নেতাদের দুষ্টামী এবং নষ্টামীকে তিনি কোর্টে প্রটেকশন দিয়ে থাকেন। ২০০১ সালে সংসদ নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু কোন রকম জনপ্রিয়তা না থাকায় তিনি এ নির্বাচনে হেরে যান। আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের তিনি মধ্যমণি। ভারত তথা 'র' এর স্বার্থ যেভাবে হাসিল হয় সেভাবেই তিনি কাজ করেন। লাভ করেন বিত্ত-বৈভব।

অথচ একসময় তাকে আ'লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল বিগত বিএনপি শাসনামলে। জানা যায়। সেবার আ'লীগ হাইকমান্ড থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, যেসব অনুষ্ঠানে কর্ণেল ফারুক-রশীদ যাবেন সেখানে আ'লীগের কেউ যেতে পারবেন না। যদি যান তাহলে তার সদস্যপদ চলে যাবে। কিন্তু ব্যরিষ্টার আমীরুল ইসলাম আদেশ অমান্য করে অমন এক অনুষ্ঠানে যোগ দিলে আ'লীগ তাকে বহিস্কার করে। অবশ্য অপমান হজম করে তিনি আবার আ'লীগে ফিরে যান।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবীর অভাব নেই। অভাব আছে দেশপ্রেমিক, দেশজ চিন্তা চেতনার বুদ্ধিজীবীর। এই পুস্তিকায় ১১ জন কথিত বুদ্ধিজীবীর স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। এরা এক সময় পাকিস্তান আমলে আইয়ুব শাহীর বিএনআর-এর সদস্য হিসেবে 'ইসলামী জমহুরিয়া'র পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। নির্লজ্জ স্তুতিতে গা ভাসিয়েছেন।

১৯৭১ সালে এদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে বিবৃতি পর্যন্ত দিয়েছেন। আবার, স্বাধীনতার পর বেহায়ার মতো মুক্তিযুদ্ধের সোল এজেন্ট সেজেছেন। বর্তমানে এদের মুখ দিয়ে যা বের হয় তা যেন ভারত প্রজাতন্ত্রের কোন নেতা-নেত্রী বুদ্ধিজীবীর কথা। এখন এরা 'ইসলাম'-এর কথা শুনলেই ভ্রু কোচকান; বাংলাদেশে খোজেন সাম্প্রদায়িকতা। ভারতকে চিহ্নিত করেন প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ দেশের মডেল হিসেবে। গুজরাটে দাঙ্গা হলে চুপ থাকেন। কিন্তু বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কাহিনী সাজান ভারতে গিয়ে। এই এদের বিবেক।

আমরা পাঠকদের কাছে এসব বুদ্ধিজীবীর স্বরূপ উদঘাটনে কিছু তথ্য প্রমাণ তুলে ধরলাম। ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ আরো তুল ধরা হবে।

-শামস জহির

স্বাধীনতা কেন্দ্র